ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আজকের মুসলিম সমাজ

আলহাজ্ব এডভোকেট বদিউল আলম

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক প্রবীণ রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত আইনজীবি এডভোকেট বদিউল আলমের জন্ম চন্দনাইশ থানার ফতেনগর গ্রামে ১৯২৬ সালে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ সনে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। আইয়ুব খানের আমলে তিনি সাবেক পটিয়ার ১৮নং জোয়ারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐ সময় বৃহত্তর চট্টগ্রামে তাঁরা ৬জন মাত্র ইউ, পি চেয়ারম্যান আওয়ামীলীগ পন্থী ছিলেন। ১৯৭২ সনে তিনি চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির সহ-সভাপতি ও ১৯৮১ সনে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এবং পরবর্তীকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ এর দক্ষিণ জেলা সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি, মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি প্রভৃতি সমাজকল্যাণ সংস্থার আজীবন সদস্য। বঙ্গবন্ধু ল টেম্পলে (আইন কলেজ) তিনি বছরাধিককাল অবৈতনিক শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সফরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তিনি ৩ বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সলিডারিটি কাউন্সিল চট্টগ্রাম, ইসলামী আইন মূল্যবোধ ও সমাজসেবা নামক সংগঠনের চেয়ারম্যান।

এ পর্যন্ত তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ ❖যা কিছু আছে ❖ আইন ও সমকালীন প্রসংগ ❖ জয় না জিন্দাবাদ ❖ দেশ হতে দেশান্তরে (ব্রিটেন ও সৌদি আরব) ❖ দেশ হতে দেশান্তরে (ভারত) ❖বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংখ্যালঘু প্রসংগ ❖ যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ ❖ উপ-মহাদেশ বিভক্তি ও আজকের বাংলাদেশ। ❖ বাংলাদেশঃ জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ ❖ রক্তের আখরে বালাকোট ❖ *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ* বইটি সাহসী উচ্চারণ হিসাবে সর্বমহলে প্রশংসিত ❖ যা কিছু মনে আছে ❖ বইটি ২য় সংস্করণ (বিস্তৃত) প্রকাশিত হবে। ❖ তাঁর লেখা *রাজনীতির একাল সেকাল প্রসংগ বাংলাদেশ* বইটি সত্য কথা বলার সৎসাহসে পরিপূর্ণ। এছাড়া ❖ *ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমার সোনার বাংলা* বই শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

তিনি Lawyer's Council নামক সংস্থার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উহা থেকে "বিচার নামক" একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়াও নিজ গ্রাম ফতেনগরে তিনি শরীফুন্নেছা নাছিরুদ্দিন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজ পাড়ায় একটি মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তিনি জেহাদে লিপ্ত আছেন।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

লেখক চট্টগ্রামের একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ও প্রতিথযশা আইনবিদ। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাঁর রয়েছে শ্যান দৃষ্টি, তাই প্রচলিত ব্যবস্থায় মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিশ্বাসের জমিনে আঘাত, তাঁর সুকুমার বৃত্তিকে নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে। সেই তাড়না থেকেই তিনি কলম তুলে নিয়েছেন। ক্ষুরধার লেখনীতে তুলে ধরতে চেয়েছেন সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি। গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ বিষয়ও সহজ সাবলীলভাবে বলে যেতে পারেন তিনি। লেখার ছত্রে ছত্রে তাঁর দূর্লভ অভিজ্ঞতার ছাপ খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। লেখকের ইসলামী সমাজের আকাঙ্খা, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর মর্মবেদনা পাঠককে নাড়া দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পরন্ত বেলায় তিনি ইসলামী সমাজ গঠনে সম্মানিত আলেম সমাজকে যুগোপযোগী কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।

লেখক হিসাবে সুধী মহলে তাঁর যে খ্যাতি রয়েছে, আশাকরি এ বইটিও পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। তাঁর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আজকের মুসলিম সমাজ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ, অধ্যাপক নাজিম উদ্দীন, জনাব ওমর ফারুক, ইব্রাহীম সহ অনেকে এর পিছনে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে বইটির মুদ্রণে সহযোগিতা করেছেন। প্রকাশনা জগতে সাইকো একেবারেই নতুন কিন্তু আনাড়ী নয়। এ বইয়ের কোন ভুল আমাদের অনিচ্ছাকৃত ও অসাবধানতা বশতঃ। পাঠক সমাজের পরামর্শ আমাদের পথ চলাকে সুন্দর ও সার্থক করবে। আমরা সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করি।

প্রচ্ছদ • মোমিন উদ্দীন খালেদ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আজকের মুসলিম সমাজ

আলহাজ্ব এডভোকেট বদিউল আলম

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল আমিন
সাইকো, ১৫৪/এ, কলেজ রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

প্রকাশ কাল ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইংরেজী

কম্পোজিশন ও মুদ্রণব্যবস্থাপনায়
সাইকো
১৫৪/এ, কলেজ রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম। ফোন-৬১২২৪২
e-mail : sico @ spctnet. com

প্রচ্ছদ ঃ মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রসেস ঃ মেজেন্টা কালার,
এন, এ, চৌধুরী রোড,
৩১, আলীফ বিপনী সেন্টার,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা মুল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

(পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি)।

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু মাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই। (৫) আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথ দেখাও। (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছো। (৭) তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমিন।

(সূরা আল-ফাতিহা)

www.pathagar.com

লেখকের প্রারম্ভিক কথন

'ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' বলে পবিত্র কুরআনে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা রয়েছে এবং আমরা মুসলমানেরা একথাটি বলে থাকলেও আমাদের মধ্য থেকে বিভ্রান্ত কতিপয় লোকসহ চিহ্নিত কায়েমী-স্বার্থন্বেষী মহল 'ধর্ম ও রাজনীতি'-এ দুটি আলাদা বিষয় বলে বুঝাতে চেষ্টা করেন।

ভারতের মুসলমানেরা ২য় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৩য় শ্রেণীর নাগরিক বলে বিবেচিত। কংগ্রেস বহুবছর দেশ শাসন করার পর ক্ষমতাচ্যুতাবস্থায় এখন বলতে শুরু করেছে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং সেজন্য তারা ক্ষমাপ্রার্থী। পশ্চিমা দেশগুলো সযত্নে আরব ভূখণ্ডে ইহুদীদের জড়ো করে 'ইসরাইল' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব কি ধর্মীয় প্রভাবের বাইরে? অথচ ওরাই 'ধর্ম ও রাজনীতি' দুটি পৃথক বিষয় বলে জোর দাবী তোলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন।

"লড়কে লেংগে পাকিস্তান" শ্লোগান দিয়ে সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। উহারই পূর্ব অংশ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান 'জয় বাংলা' বলে বাংলাদেশ বানিয়েছি। পরবর্তীতে দেখা গেল যাদের বন্ধু ভেবে আমাদের মুক্ত করার কাজে সাহায্যের জন্য ডেকে এনেছিলাম তারা আসলে বন্ধু নয়, আগ্রাসী ও আধিপত্যবাদী শক্তি। আমরা সবিস্ময়ে দেখতে পাই যে, প্রতিবেশী আগ্রাসী শক্তি বাংলাদেশকে তিলে তিলে শেষ করে দিতে চায়। এ পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে কোন কাজ করেছে বলে প্রমাণ নেই। তাই সোনার বাংলাকে রক্ষার তাগিদে আমি ও আমার মত সমমনা অনেকে রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তৎফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শন নির্ণয়ে সচেষ্ট হই। দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে আমার এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাই এ রাষ্ট্রের রক্ষাকবজ ও চালিকাশক্তি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট বলেই সাবেক বংগের পূর্বাঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান হয়ে আজকের বাংলাদেশ। এর বাইরে অন্য কোন তত্ত্ব ও তথ্য আছে বলে আমার জানা নেই। সর্বক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থা স্বার্থক রূপায়নই এ রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করতে পারে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে।

আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের ঈমানের কমজোরী, জ্ঞান-বুদ্ধি ও মেধা-দক্ষতার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের ফলে বর্তমানে একজন অমুসলিম সমান দশ জন

www.pathagar.com

মুসলিম। অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগে একজন মুসলিম সমান ছিল একশত অমুসলিম।

জীবনের এ প্রান্ত সীমায় এসে আমাদের অনুভব ও উপলব্ধিতে এসেছে যে ইসলাম সম্পর্কে আমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান খুবই সীমিত। তবে আমি আমার এ লেখায় এমন অনেক কিছু সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি যা সাধারণভাবে চোখে পড়ে না। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তদুপরি আমি কারো মনে কষ্ট দিতেও চাইনি। আমার আন্তরিক প্রয়াস-মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি সর্বোপরি, মুসলমানদেরকে মৌলিকত্বের দিকে ফিরিয়ে আনা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে তাদের চেতনা শক্তিকে শাণিত করা, যা আগামী বিশ্বে মানব জাতির শান্তি সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। এর পরেও আমার লেখাতে কোন ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন যোগ্য, কেউ জানালে বাধিত হব।

পরিশেষে, বইটি লেখার ব্যাপারে কনিষ্ঠ আইনজীবী আলহাজ্ব নাজিম উদ্দীন সাহেব, আবদুল মোতালেব ও কামরুল হাসান নাজিম অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর আবদূন নূর সাহেব বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বলে আমি তাঁর কাছে ব্যতিক্রমী একঋণে আবদ্ধ হলাম, তাছাড়া প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও চট্টগ্রামের ঐহিত্যবাহী প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়্যেদ আবু নোমান সাহেব এবং প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ জনাব আহ্মেদুল ইসলাম চৌধুরী বইটি পড়ে মতামত দিয়েছেন বলে তাঁদের কাছেও আমি ঋণী। প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে যেভাবে সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন- আমীন।

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলামের নবী একবার তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এই বলে যে, 'এমন একটি সময় আসবে যখন মুসলমানগণ অন্ধভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পথ ও পন্থা সমূহ অনুসরণ করতে থাকবে যদিও সেসবের অনেক কিছুই অনৈসলামিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হবে। এমনকি ইহুদী নাসারাগণ যদি তাদেরকে এভাবে গুইসাপের গর্তেও ঢুকিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়, মুসলমানগণ অবিবেচকের মত তাও অনুসরণ করবে' *(সহীহ মুসলিম)*। আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইসলামের বার্তাবাহকের ভবিষ্যৎবাণীরই প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায়। আমাদের রাজনীতি চর্চা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড,সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা এবং এমনকি, পোষাক আশাক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতেও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ চলছে অপ্রতিহতভাবে। কোথাও দেশজ বা নিজস্ব আদর্শ বা ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ বলে গর্ব করে বলার কিছুই নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, পাশ্চাত্য বা ইহুদী ও খৃষ্টান বিশ্ব আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষতায়, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং সর্বোপরি, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যে সফলতা অর্জন করেছে, তার কোন প্রতিফলন সমকালীন মুসলিম বিশ্বের দেশগুলিতে অনুপস্থিত।

বিজ্ঞান, শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের এই যুগে মুসলিম বিশ্বের অনগ্রসরতার জন্য ইসলামী বিশ্বাস ও আকীদাকে দায়ী করে সাম্প্রতিককালে বহু পশ্চিমা পন্ডিত বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনায় তৎপর হয়ে পড়েছেন। ১৯৭৯ সালে মুসলিম উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলনে মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মহাথির মুহাম্মদ আক্ষেপের সূরে প্রশ্ন রেখেছিলেন, বিশ্বের শতকরা ৬০ ভাগ পেট্রোলিয়াম ও টিন, ৫০ ভাগ রাবার, ৩০ ভাগ কাঠ এবং ২০ ভাগ ভোজ্য তৈল উৎপাদন করা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব আজ কেন অনুন্নত? কেন পাশ্চাত্যের উপর এত নির্ভরশীল ? ১৯৮০ সালে পরিচালিত অপর এক জরিপে দেখা যায়, মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে ৯টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজতন্ত্র ! ১১টিতে বিকৃত গণতন্ত্র এবং ২৩টি তে স্বৈরতন্ত্র ! শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রে বিপ্লবের মাধ্যমে (১৯৭৯) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা। পাশ্চাত্য গবেষকগণও আজ এ কথা স্বীকার করছেন যে, বিচার-বিবেচনা না করে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণই মুসলিম দেশগুলির রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতিতে বিপর্যস্ত পরিস্থিতির জন্য মূলতঃ দায়ী।

আরবী 'সালামা' থেকে **ইসলাম** শব্দের উৎপত্তি যার বুৎপত্তিগত অর্থ দু'টি - একটি হচ্ছে আত্মসমর্পণ এবং অপরটি শান্তি। মহান স্রষ্টা ও প্রভূ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে আত্মসমর্পণ ও তাঁর রসুলের মাধ্যমে প্রেরিত আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে শান্তি লাভ। এটিই ইসলামী দর্শনের মূল কথা। আজ শিল্পোন্নত বিশ্বে ভোগ প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও মানুষের মনে শান্তি নেই। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিভিন্ন শহরে যুবক-যুবতীগণ যথাযথ বিশ্বদর্শন ও শান্তির অন্বেষায় দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'প্রাচুর্যময় জীবন একঘেয়েমীপূর্ণ, ওতে দৈহিক তৃপ্তি আছে কিন্তু মনের সুখ নেই। জনজীবন বিচ্ছিন্নচাচে গিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পাইনি। জীবনকে চ্যালেঞ্জ মনে করে অপরাধ জগতে বিচরণ করেছি। সুখ লাভের আশায় মাদকাসক্ত হয়ে

www.pathagar.com

বিভোর থেকেছি। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই, শান্তি খুঁজে পেয়েছি ইসলামে যেখানে জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে, এখানে আছে বিভিন্ন আদর্শ ও অধিকারের কথা। অধিকারের সাথে বলা হয়েছে সুনির্দিষ্ট 'দায়িত্বের কথা , আর আছে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপনের জন্য কতিপয় সমন্বিত নীতিমালা'।

ইসলাম আবার পর জীবনমুখী বা শুধু আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্ম নয়। বস্তু ও আত্মা, ইহকাল ও পরকাল এবং দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে ইসলাম হচ্ছে মানুষের জন্য এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার পথ নির্দেশিকা। ইসলামী ইবাদতে প্রভূর কাছে মানুষ নিবেদিত হয়ে প্রার্থনা করে," হে প্রভূ! আমাকে ইহ জগতে কল্যাণ দান কর এবং পরজীবনেও কল্যাণ দান কর" (আল্-কোরআন, ২ঃ২০১)। আমাদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত পবিত্র কোরআনের প্রথম প্রত্যাদেশ হচ্ছে 'ইক্‌রা' অর্থ্যাৎ পড়! সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতে দু'বার পড়া এবং একবার কলমের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অবাক হবার বিষয় হচ্ছে , মুসলিম বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ আজো পড়তে লিখতে জানেনা ! শিক্ষা মানুষের প্রতিভাকে বিকশিত করার সাথে সাথে, মানুষকে অধিকতর সক্ষম ও সমাজের জন্যে অধিকতর উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলে। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেছেন, 'পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলীতে যা কিছু আছে তা তিনি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন (আল কোরআন ১৫ ঃ ১৯-২০, ৩১ঃ ২০)'। তাঁর নির্দেশ হচ্ছে, "ওয়ালা তানছা নাসিবাকা মিনাদ্দুন্‌য়া" অর্থাৎ আমরা যেন পৃথিবীর পাওনাকে অবজ্ঞা না করি (আল-কোরআন ২৮ ঃ ৭৭)। আকাশ ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ও নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ। তাই আল্লাহ্ বলেন, "ওয়ামাই য়্যুতিয়াল হিক্‌মাতা ফাকাদ উ'তিয়া খায়রান কাছিরা" অর্থাৎ যাকে বিজ্ঞানের জ্ঞান দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় (আল্-কোরআন, ২ ঃ ২৬৯)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কোরআনের অনুসারী বলে পরিচিত মুসলমানগণই আজ পৃথিবীতে সবচাইতে অনগ্রসর জাতি !

আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, "ওয়া আমরাহুম-শূ'রা-বাইনাহুম" অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে কর্ম সম্পাদন কর আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে (আল-কোরআন, ৪২ঃ ৩৮)। অথচ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলির সরকার ব্যবস্থার অধিকাংশই হয় রাজতন্ত্র আর না হয় স্বৈরতান্ত্রিক। এভাবে পরিচিতিতে মুসলিম কিন্তু আচরণে কোরআনের বিপরীত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান বিশ্বের অনুসারী-এটাই সম্ভবতঃ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অনুন্নয়ন এবং অমুসলমানদের হাতে অসহায়ভাবে নির্যাতিত হবার প্রধান কারণ। এ বিষয়ে সতর্ককারী কোরআনের বাণী হচ্ছে, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামত দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে" (সূরা বাকারা, ২ঃ ৮৪)। এখানে মৌলিক প্রশ্নটি হচ্ছে, মুসলিম সমাজের এই অধঃপতনরোধ কিভাবে সম্ভব? গুইসাপের অন্ধকূপ থেকে মুসলমানদেরকে কে উদ্ধার করবে? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, যারা কিছুটা আলোর ছটা দেখতে পান একমাত্র তাদের পক্ষেই এই দায়িত্ব পালন সম্ভব। বর্ষিয়ান আইনজ্ঞ **আলহাজ্ব বদিউল আলম** এই প্রাথমিক দায়িত্বটি পালনে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর রচিত ***ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আজকের মুসলিম সমাজ*** গ্রন্থটি মূলতঃ এই দায়িত্ববোধ থেকেই উৎসারিত। একজন

www.pathagar.com

অভিজ্ঞ পেশাজীবী হিসাবে, একজন প্রতিশ্রুতিশীল মুসলিম হিসাবে এবং একজন সমাজ দরদী চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর মধ্যে যে ত্রিমুখী দায়িত্ববোধের সমাবেশ ঘটেছে, তারই সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে, উল্লেখিত পুস্তকটিতে। 'ইসলামই মুসলমানদের উত্তরণের একমাত্র পন্থা-এই সত্যটিই নির্যাস আকারে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর রচনায়। তিনি ঝিমিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে জাগাতে, তাদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী করে ইসলামী আদর্শে সমাজ বিনির্মাণে সকল ইসলামপন্থী বিশেষ করে আলেম সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। এজন্য আলেম সমাজকে মুসলিম উম্মার ঐক্যের স্বার্থে নিজেদের মধ্যকার *ফেরকা* পরিহার করার এবং তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক যুগোপযোগী বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও পারদর্শী হবার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে এ কথাটি আমাদের ভুলে থাকলে চলবেনা যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া যেমন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না, তেমনি গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে হলে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে, ইসলামী আদর্শের সফল বাস্তবায়ন ও জনগণ কর্তৃক তার সুফল ভোগের জন্য ইসলামের নবীর আদর্শে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম অপরিহার্য। দূর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, ইসলামী শাসনের ঐতিহ্য বিশ্ববাসীর কাছে অজানা না হলেও সমকালীন মুসলিম বিশ্বে লজ্জাস্করভাবে অনুপস্থিত। আলোচ্য গ্রন্থের ক্যানভাস মুসলিম উম্মা হলেও লেখক স্বদেশের সমস্যাবলীর কথাও তুলে ধরতে ভুলেননি। দীর্ঘদিন আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত থেকে এর জনস্বার্থ বিরোধী দিকসমূহ চিহ্নিত করে আইন ও আইন প্রশাসনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও এদেশের সামাজিক ব্যাধি যার অধিকাংশই ইসলাম বিরোধী যেমন যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন, বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তি, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কার, যুব সমাজের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রকোপ, নগর বাসীদের মধ্যে গ্রামীন ঐতিহ্যবিরোধী আড়ম্বরতা ও অপচয়ের প্রবণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষকে সোচ্চার এবং এসবের সমাধানে ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথা, আইন, ইতিহাস ও রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাধিক পুস্তকের প্রণেতা সব্যসাচী এই লেখকের সমাজের প্রতি, সমাজে বসবাসকারী মানুষগুলির প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই পুস্তকটির সৃজন। মুসলিম উম্মার পুনর্জাগরণে এটি লেখকের একটি সামাজিক প্রয়াস। বইটি রচনা করে লেখক গুইসাপের গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে উম্মার জন্য মুয়াজ্জিনের কাজ করেছেন। বইটি পড়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে যদি একবার জাগরণ শুরু হয় তখন গুইসাপের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পাবার পন্থা নিজেরাই খুঁজে নিতে সক্ষম হবে। তথ্য সমৃদ্ধ এ বইটি আকারে ছোট মনে হলেও এটি মুসলিম বিশ্বের আকাশে প্রভাত সূর্যের কিরণচ্ছটা। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

২৬শে আগস্ট, ১৯৯৭

আবদুন নূর
প্রফেসর
লোক প্রশাসন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ইসলামী দর্শন	ঃ	১৩
ইসলামী জীবন পদ্ধতির রূপরেখা	ঃ	১৪
নামাজ	ঃ	১৬
রোজা	ঃ	১৮
মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায়	ঃ	১৯
বর্তমান মুসলিম সমাজে মসজিদের ভূমিকা	ঃ	২১
মসজিদ কেন্দ্রীক সমাজ	ঃ	২২
মসজিদের ইমাম	ঃ	২২
মসজিদ ও রাজনীতি	ঃ	২৩
ইমাম সাহেবদের ধর্ম চর্চা	ঃ	২৫
ভাষাজ্ঞান	ঃ	২৫
ইমাম সাহেবদের ব্যক্তিত্ব	ঃ	২৭
সামাজিক অনুষ্ঠান	ঃ	২৭
আলেম সমাজের অনৈক্য	ঃ	২৮
কবর জিয়ারত	ঃ	৩১
ভিক্ষাবৃত্তি	ঃ	৩১
দাতা দেশ ও বাংলাদেশ	ঃ	৩৩
যাকাত ফিতরা ও দান খয়রাত	ঃ	৩৩
ইসলামের বুনিয়াদী পাঁচ স্তম্ভ	ঃ	৩৭
সালাম দেওয়া নেওয়া	ঃ	৩৮
বাস্তববাদী হওয়া আবশ্যক	ঃ	৪০
মুসলমানদের জীবন প্রণালী	ঃ	৪১
বহু বিবাহ	ঃ	৪৫
জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও জন্ম শাসন	ঃ	৪৬
তালাক	ঃ	৪৬
আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতা	ঃ	৪৭
অবৈধ আয়	ঃ	৪৯
পোষাক-পরিচ্ছদ	ঃ	৫১

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিজ্ঞান	ঃ	৫১
মুসলিম পরিচয়	ঃ	৫৩
পেশাগত সততা	ঃ	৫৫
ত্যাগ ও ভোগ	ঃ	৫৭
মসজিদ মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র	ঃ	৫৭
পাশ্চাত্যের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা বনাম	ঃ	৫৮
ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও চলমান বিশ্বে ইসলাম	ঃ	৬০
ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আজকের মুসলিম সমাজ	ঃ	৬২
ধর্ম ও রাজনীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা	ঃ	৬৫
ইসলামে সংস্কৃতি চর্চা	ঃ	৬৮
ইসলামী চিন্তা-চেতনা ঃ মুসলিম মন ও মননশীলতা	ঃ	৭২
ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মুসলিম চরিত্র	ঃ	৭৪
শেষ কথা	ঃ	৭৫

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

অন্য ধর্মে যাই থাকুক না কেন মুসলমানদের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি ইসলাম ধর্মে দেওয়া আছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী আইনের উৎস হলো কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। যেহেতু ইসলাম একটি গতিশীল ধর্ম সেহেতু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রগতির পথে কোন প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করেনা। ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্ কোরআনই বিজ্ঞান। আল্ কোরআনের আয়াতগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতি পূর্ণ। এ পর্যন্ত আল্ কোরআনের কোন আয়াতই আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে আসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। *ফরাসী বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলি* ও এ কথা স্বীকার করেছেন *(বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান)* তাই বিজ্ঞানের যতই অগ্রযাত্রা চলছে ততই আল-কোরআনের আয়াতগুলির রহস্য উৎঘাটিত হয়ে চলেছে।

ইসলামী দর্শন

আল্লাহ তায়ালা বলেন- *'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইন্‌সা ইল্লা লি আ'বুদুন'।* *অর্থাৎ 'জ্বিন এবং ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।'* **তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে তাদের সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করে চলেছে। মহাশূণ্যে**

www.pathagar.com

অনেক কিছু আছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু উহার অস্তিত্ব যে আছে তা নিয়ে কেউ বিতর্ক করেন না। এমনিভাবে জ্বিনও অদৃশ্যমান জীব। ইনসান অর্থ মানুষ। মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি মমমমকরেছেন বলে আল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন। মানুষ বা ইনসানের দুনিয়মমমাবী জীবন যাপনের জন্যে যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি দেওয়া আছে। নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে জীবন যাপন করা হলে সব কিছু ইবাদতের সামিল হয়। এতে করে বুঝা যায় যে, আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু আছে তার সবই ইসলামী বিধি বিধান মোতাবেক পরিচালিত হলেই তা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে। জ্বীন ও ইনসানকে যদি আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ইবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করে থাকেন, তবে ইবাদাত শব্দটা ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হবে। ইসলাম শব্দ আরবী আর মুসলিম শব্দ ফার্সী। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই মুসলিম। আর মুসলিম মানেই আত্মসমর্পনকারী শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে হবে। সূরা আল্ বাকারার প্রথম কয়েক আয়াতের মধ্যেই বলা হয়েছে,-*'যা-লিকাল কিতাবু লা-রাইবা ফিহি হুদাল্লিল মুত্তাকিন।' অর্থাৎ 'নিশ্চয় ইহা এমন একটি কিতাব যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, ইহা মুত্তাকিদের জন্যে হেদায়াত।'* হেদায়াত হলো আল্লাহর দেওয়া বিধান মতে জীবন পরিচালনা করা। যারাই আল্লাহর বিধান মতে জীবন পরিচালনা করে তারাই মুত্তাকি। যারা গায়েবে ঈমান আনে বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে এবং আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে অপরকে দেয় তারা অবশ্যই হেদায়াত প্রাপ্ত। এই হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই মুত্তাকি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় বিধি বিধান রাসূলে করিম (সঃ) এবং তাঁর সাহাবা (রাঃ) গণের জীবন পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত। ইসলামী জীবন পদ্ধতি কার্যকর ভাবে ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারলে তাই হবে ইবাদত। এই ইবাদতের জন্যেই মানুষের সৃষ্টি।

ইসলামী জীবন পদ্ধতির রূপরেখা

ইসলামী জীবন পদ্ধতি সহজ ও সরল। যে কেউ ইহা তার ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন। পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতি অনুসরণকারীরাই মুসলিম। এই জীবন পদ্ধতির একটি সার্বজনীনতা আছে। মুসলমানদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই ইসলাম ধর্মের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন, মুসলমানদের ঘরে একজন শিশু জন্ম হলেই সেই শিশু শুনে মতো তার কানের কাছে গিয়ে

www.pathagar.com

আযান দিতে হয়। শিশু আযান শুনেছে এবং আযানের মর্মার্থ তার হৃদয়ে স্থান দিয়েছে এই বিশ্বাস থাকতে হবে। মুসলমান নারী পুরুষের মৃত্যুকালীন সময় থেকে আরম্ভ করে কাফন-দাফন পর্যন্ত সবকিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম মাফিক হতে হয়। সেখানে মৃত ব্যক্তির পাপ মোছন ও আযাব-গজব থেকে মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তি পর্যন্ত সব কিছুর জন্যে দোয়া-দরূদ আছে। এ ক্ষেত্রে এক মিনিটের নীরবতা পালনে কোন কল্যাণ নেই। আছে মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনায়। ইসলাম বিশ্বাসীদের ধর্ম। আল্লাহকে কেউ দেখে নাই। আল্লাহ যে আছেন এই বিশ্বাস বিশ্বাসীদের অবশ্যই থাকতে হবে এবং এই বিশ্বাসও থাকতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে জীবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে নবী করীম (সঃ) এর কাছে ওহী নাজিল হয়েছে এবং উহারই সংকলন হল মহাগ্রন্থ আল কোরআন। এও বিশ্বাস থাকতে হবে যে, রোজ কিয়ামত আছে। অর্থাৎ পৃথিবী বিলীন হয়ে যাওয়ার একটি দিবস আছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীন এর দরবারে হাজির হতে হবে এবং বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। ইহকালের সব কিছুর জন্যেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ সবই বিশ্বাসের ব্যাপার। ছোট কালে পড়েছিলাম, *'বিশ্বাসে পাইবে প্রভু, তর্কে কভু নয়'।* শিশুকে শৈশবে ঘরে অথবা শিক্ষালয়ে কোরআন শিক্ষা দিতে হয়। আল কোরআন যেহেতু আরবীতে নাজিল হয়েছে সেহেতু আরবীতেই উহা পড়া ও মুসলমান শিশুদের শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য। আল কোরআন নিজের ভাষায় অনুবাদ করে পড়লে বুঝতে সুবিধা হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আরবী ভাষায় আল্ কোরআন তিলাওয়াত করলে সওয়াবও অনেক বেশী এবং ইহা পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে। কারণ ঐ ভাষাতেই আল্ কোরআন নাজিল হয়েছে। আল-কোরআনের-ছুরা আর রাহমান ভাল করে পড়লে এবং উহার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে অদৃশ্যে বিশ্বাস আনার মত অনেক উপাদান পাওয়া যাবে। নামাজের ফজিলত সম্পর্কে আল-কোরআন এবং হাদিসে বহু বর্ণনা আছে। উহা শরীরকেই শুধু পাক-সাফ করেনা হৃদয় মনকেও পরিশুদ্ধ করে। ইহা মানুষের ভিতরের ইন্দ্রিয় কামিতা কমায়। আল-কোরআনে বলা হয়েছে, *"নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ফলে দেহের রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক থাকে। মুসলমানদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, prayer is Power. যদি ইহা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করা হয় তাহলে তা এটমের চেয়েও শক্তিশালী হবে।

www.pathagar.com

নামাজ

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি উপাদানের মধ্যে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের পরেই নামাজের স্থান। বিশ্বাস অন্তরের বিষয়। নামাজের যে সকল নিয়ম কানুন আছে যেমন-অজু থেকে আরম্ভ করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সবই বিধিবদ্ধ নিয়মমাফিক করতে হয়। একিন, আমল ও নিয়ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হচ্ছে ততই কোরআনের আয়াতগুলির যথার্থতা ও বাস্তবতা মানব সমাজের নিকট প্রতিভাত হচ্ছে। আল-কোরআনে এমন কতগুলি বিষয় আছে যা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আওতায় নাও আসতে পারে। বিজ্ঞানের দ্বারা উহার সত্যতা আবিস্কারের জন্যে আরো শত সহস্র বৎসর প্রয়োজন হতে পারে। আল কোরআনেই বলা হয়েছে যে, সব কিছুর একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এরই সূত্র ধরে আধুনিক বিজ্ঞান বলছে যে, পৃথিবীর সব কিছুই একটা আকর্ষণের দ্বারা সূত্রাবদ্ধ। সে আকর্ষনের নাম মধ্যাকর্ষণ শক্তি। যেদিন আল্লাহতায়ালা এই শক্তি তুলে নেবেন সে দিনই কিয়ামত সংগঠিত হবে। এভাবেই আল্ কোরআনের বাণী সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে যে, মানুষের ইহ জীবন ক্ষণস্থায়ী, পরকালীন জীবন চিরস্থায়ী। দুনিয়া হলো আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ। মানুষ দুনিয়াতে যেমন কর্ম করবে তার ফলই সে পরকালে অর্জন করবে। আমরা সকলেই শূণ্যের উপর ভাসমান একটি গ্রহে অবস্থান করছি। পৃথিবীর সব কিছুই এভাবেই আছে। এ রকম বহু গ্রহ নক্ষত্রের কথা সুরা আর-রাহমানে বলা হয়েছে। নামাজ ইবাদাতের একটি অংশ। সকল ধর্মে ইবাদাত বা উপাসনা আছে। তবে ইসলাম ধর্মে নির্দিষ্ট সময়ে নামাজের কথা বলা হয়েছে। অজু এবং নামাজের উপকারিতা আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত। বলা হয় যে, এতে শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য পালন পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে এবং ইহা অতীব বিজ্ঞানসম্মত। এক অমুসলিম লোককে মুসলমান হবার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, মল-মূত্র ত্যাগের পর শরীর পাক-সাফ রাখার যে নিয়ম পদ্ধতি ইসলামে আছে তা শরীর ও শরীরের পোষাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং হৃদয় মনের পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে খুবই সহায়ক। প্রশ্রাব করার পর উহার কিছু অংশ কাপড়ে ও শরীরে লেগে গেলে মনের উপর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, উহা থেকে রক্ষার সহজ উপায় হিসেবে ঢিলা-কুলুক-পানি ব্যবহারের পদ্ধতি স্বাস্থ্য সম্মত দেখে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। নামাজের অজু-নিয়ত সহ আল কোরআনের যা কিছু তিলাওয়াত করে রুকু সিজদা এবং সর্বশেষে সালাম ফিরানো হয় তা সবই ইবাদতের সামিল। তাহলে দেখা গেলো ইবাদতের সংজ্ঞা খুবই ব্যাপক হলেও

www.pathagar.com

কষ্টকর কিছু নয়। শরীর ও মনের জন্যে যা কিছু উপকারী তা পালন করাও ইবাদত। নামাজের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রশংসা সমস্ত নবী, ওলী এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের রূহ মুবারকের উপর সওয়াব বকশিষ এবং মা-বাবা, দাদা-দাদী সহ সকল আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ ও নিজের পরিবারের লোকজনদের গুনাহ্ মাফ চেয়ে প্রার্থনা ও সমস্ত মানুষের কল্যাণ কামনা করা প্রভৃতি ইবাদতের সামিল। এ কল্যাণকর বিষয়টি সম্পর্কে আমরা শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ওয়াকিবহাল নই। ফলে গায়েবানা জানাজা পড়তে কিছুই মুখে আসেনা। আমাদের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৭০/৮০ জন লোক জানাজার নামাজের নিয়ত-দোয়া কিছুই জানেন না। ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবর বললে তখন হাত তুলবে নাকি রুকুতে যাবে তাও জানেন না। এই হলো আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার মান। বিভিন্ন মাযহাবে নামাজের পদ্ধতিগত ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও মূল বিষয়ের ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। হজ্বের সময় বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন মাযহাবের লোক এক সাথে নামাজ আদায় করেন। পদ্ধতিতে সামান্য কিছু তারতম্য থাকলেও তা নিয়ে কেউ বাক বিতন্ডা সৃষ্টি করেন না। কেননা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি কামনাই আসল। আজান হল নামাজের জন্য ডাকা। এতে কল্যাণের দিকে আসার কথা বলা হয়েছে। ফজরের আজানে ঘুম থেকে নামাজ উত্তম বলে ধ্বনিত হয়। ঘুম অপেক্ষা প্রার্থনা শীরোনামে *'আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম'* বিষয়ের উপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের *অধ্যাপক আবদুন নূর সাহেবের* বইতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে নামাজের উপকারিতার উপর গবেষণামূলক লেখা আছে। ধর্ম সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান থাকা এবং ভাসা ভাসা কাজ করা ঠিক নয়। এ সম্পর্কে প্রত্যেকের ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং উহা যতদূর সম্ভব মেনে চলা কর্তব্য। এদেশে কমিউনিষ্টরা মরার পর মুসলমান হয়। সেদিন এক পত্রিকায় দেখলাম মরার পর কমরেড জামাল মুসলমান হয়েছে। অনুরূপভাবে কমরেড ফরহাদও মৃত্যুর পর মুসলমান হয়েছিলেন এবং তার ধর্ম নিরপেক্ষ জানাযাও হয়েছিল। সে জানাযায় বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা শরীক হয়েছিলেন যার ছবি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কথাটা শুনতে অবাস্তব মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি বাস্তব ঘটনা। আমরা কমিউনিজম বা যে ইজমই করি না কেন জীবিত থাকাবস্থায় ধর্মের বিপরীত চললাম আর মরার পর আত্মীয়-স্বজন মৃতের বাপদাদার ধর্ম অনুযায়ী তার সৎকার এর ব্যবস্থা করলেন এটা শুনতে এবং দেখতে কেমন মনে হয়। অন্য ধর্মাবলম্বী কমিউনিষ্টরাও ইহকালে ধর্মের বিরুদ্ধে বলেন এবং চলেন কিন্তু মৃত্যুর পর তার নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী তার

www.pathagar.com

সৎকার করেন। অবশ্য সৎকার করার ব্যাপারে মৃত ব্যক্তির কোন হাত থাকেনা। মৃত্যুর আগে মৃত ব্যক্তিও বলে যান না যে, তার মৃত দেহ পোড়ানো হবে নাকি কবরস্থ করা হবে। নাস্তিক মহোদয়রা ! এই প্রকার ঝামেলা জীবিতদের জন্যে রেখে যাওয়া ঠিক নয়। ভারতের এককালীন প্রধান বিচারপতি জনাব হেদায়াত উল্লাহ্ সাহেবের মৃত্যুর পর তার মৃত দেহ পোড়ানো হয়েছিল। তিনি কি তার মৃত দেহ পোড়ানোর কথা বলে গেছেন নাকি তার স্ত্রী-পুত্র কন্যারা পোড়াবার ব্যবস্থা করেছেন তা অবশ্য জানা যায়নি। মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করেও হিন্দু পত্নির প্রভাবান্বিত পরিবেশে হেদায়াত উল্লাহ্ সাহেব হেদায়াত উল্লাহ্ নামক ইসলামী নাম ধারণ করেও হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে সামিল ছিলেন না। আন্তঃসম্প্রদায় বিবাহ্ সম্পর্কে যারা বলেন তারা এ থেকে কিছু শিক্ষা নিতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে ঈমানদারেরাই মুমিন। অবশ্য আল্ কোরআন ব্যতীত অন্য আসমানী কিতাবের অনুসারীরাও সীমিত অর্থে বিশ্বাসী বটে কিন্তু মুমিন নয়। মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেন তারা **'মোত্তাকি'** এবং যারা সৎ কর্ম পরায়ন তারা **'মুহ্ছিন'**। আর যারা প্রভূর কাছে আত্ম সমর্পনকারী এবং প্রভূর দেওয়া জীবন বিধান মেনে চলেন তারা হলেন মুসলিম। হৃদয়-মনে পোষাক-পরিচ্ছদে পাক-সাফ এর পরেও ইসলামে নামাজের আগে অজুর বিধান আছে। অজুর আগে মিসওয়াক করলে দাঁত ঠিক থাকে ও মুখের গন্ধ দূর হয় এবং দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্যে পানি দিয়ে অজু করলে স্বাস্থ্য বিধি পালন করা হয়। এইরূপ পবিত্রতায় পূণ্য সঞ্চয় হয় এবং নামাজে শরীর চর্চার সাথে হৃদয় মনে অনাবিল পবিত্রতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নামাজ মৃত্যু সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। বিভিন্ন দেশের বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অপ্রতুলতা প্রকট। ইসলামের ব্যাপারে এই অজ্ঞতার পিছনে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থই সক্রিয়।

রোজা

রোজা রাখার জন্যে একটি মাস নির্দিষ্ট আছে উহাকে রমজান মাস বলা হয়। যারা রমজান মাসে রোজা রাখেন এবং রমজান ব্যতীত অন্য বিশেষ বিশেষ দিনেও রোজা রাখেন তাদের সাথে রোজাদারদের আত্মিক মিল হয়ে যায়। রমজান মাসে রোগ ব্যাধি কম হয়। রমজানে সত্যিকার রোজাদারগণ দূর্বল হননা বরং সবল থাকেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আমি বড় বড় চিকিৎসকদের মতামত নিয়ে দেখেছি যে, রোজা রাখা হৃদ রোগীদের জন্যে ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী। রিপু দমন হয় বলে শরীরের গ্রন্থী গুলি এসময় শান্ত থাকে। রমজান কোন রাজনৈতিক

www.pathagar.com

অনশন নয় অথবা উপবাসের নামও নয়। উহা পালনের বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন আছে। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ বা রোকনে মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের শান্তির নিশ্চয়তা আছে। সমস্যাটা হলো আমরা নিজেকেই চিনিনা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকেও চিনিনা। জ্ঞান বুদ্ধির অভাবে আমরা ইসলামকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে অসমর্থ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে Invest money get profit Invest mind and soul get providence.

মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায়

মসজিদে জামায়াতের সহিত নামাজ আদায়ের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেটাও মানুষের কল্যাণে। জামায়াত বদ্ধ হয়ে নামাজ পড়লে ফায়দা এই কারণে বেশী যে, আল্লাহ্ তায়ালা চান তাঁর বান্দাহরা দিনে পাঁচবার জামায়াতে শরীক হউক যাতে তাদের মধ্যে একাত্মতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে। সর্বোপরি সকলের মিলিত ফরিয়াদ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এর আরো একটি বিশেষ দিক হলো মসজিদের পরিবেশ হল পবিত্র। এই পবিত্র পরিবেশে প্রার্থনা কবুল হবার সম্ভাবনা বেশী। অথচ আমরা আধুনিকেরা এই সব জানতে চাইনা। জানাবার জন্য যারা আছেন তারাও অনেকেই হয়তো কার্পণ্য করেন। নয়তো তারা সার্থক ভাবে উহা উপস্থাপন করতে সমর্থ নন। নামাজ শ্রেষ্ঠ এবাদত। দিনে পাঁচবার নামাজে শরীক হওয়া, সপ্তাহে একদিন জুমার নামাজে শরীক হওয়া, বছরে দুইবার দুই ঈদে বড় জামায়াতে শরীক হওয়া, সর্বোপরি হজ্বের সময় বিশাল জামায়াতে অংশগ্রহণ এর বিধান তাৎপর্যপূর্ণ। কাবা শরীফ, মদীনা শরীফ ও আরাফাতের ময়দানে ফরজ নামাজে চার মাজহাবের লোক শরীক থাকে। শিয়া-সুন্নী থাকে ওয়াহাবী-সুন্নী থাকে। কিন্তু কেউ কি কোন সময় ঐ সব জামায়াতে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সম্পর্কে কোন তরিকার প্রশ্ন উত্থাপন করেন? বিশাল মুসলিম জনতা সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সেখানে একাকার হয়ে যান। বর্ণ গোষ্ঠীর কোন প্রশ্ন থাকেনা। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, বাদামী, হলুদ, লাল বর্ণের কোন তারতম্য থাকেনা। আল্লাহর বান্দাহরা সেখানে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকে। *"লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক"* উচ্চারণে ভক্তবৃন্দের অশ্রুসজল নয়নে দরূদ শরীফ ও জিকিরে অযুত কণ্ঠের গুঞ্জরণে যে অভাবনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তা পরিবেশকে করে তোলে ভাবগম্ভীর। কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীতে ফজরের আগে তাহাজ্জুদ নামাজের আযান হয়। তাহাজ্জুদের নামাজ ভক্তদের হৃদয়ে অনাবিল শান্তি আনে। ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা

www.pathagar.com

মোয়াজ্জমা ও মদীনা মনোয়ারায় সাধারণ আরববাসীরা প্রায় সময় দরূদ শরীফ পড়ে। তাই বলে আযানের আগে মুয়াজ্জিনের মুখে উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পড়ে আযান দিতে শুনিনি। ভারতের অনেক বড় বড় শহরে গিয়েছি, ইউরোপ আমেরিকায়ও গিয়েছি, অসংখ্য মসজিদে নামাজ আদায়ের সুযোগ দিয়েছেন পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা। কোথাও এ নিয়ে কোন কিছু শুনিনি বা দেখিনি। এক এক আকিদার লোক যদি ইসলামী জীবন বিধানের মধ্যে তাদের পছন্দমতো নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করে তবে ইসলামের মৌলিক আকিদা থেকে অবশ্যই আমরা আলাদা হয়ে যাবো। এতে ইসলামী উম্মাহর ঐক্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। দরূদ শরীফের ফজিলত অসীম তবে এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। আযানের উদ্দেশ্য হলো নামাজ আদায়ের জন্যে মুসলমানদেরকে জামায়াতের স্থানে ডাকা। অর্থাৎ *'তোমরা নামাজের দিকে আস, কল্যাণের দিকে আস, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত রসুল এবং আযানের সর্বশেষ বাক্যটা হলো 'আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নেই।'* নামাজটা পুরোপুরিই আল্লাহ এবং রাসুল (সঃ) এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মৌলিক আকিদা গুলির তিন চতুর্থাংশই মুসলমানদের কাছে অজানা এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এতটুকু পর্যায়ে পৌছেছে যে, মুসলমান নামধারী এক শ্রেণীর লোক আল্লাহর বিধি বিধানের প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপনকারী পরহেজগার লোকদেরকে ইসলামপন্থী এবং মোল্লা বলে গালি দেয় ও কোন কোন সময় তাদেরকে হত্যা পর্য্যন্ত করে। মসজিদ ও নামাজ নিয়ে দলাদলি ও মারামারি করছি। এই সবহল অপকর্ম যা আল্লাহর পাককালামে বারণ করা হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল্ কোরআনে বলা হয়েছে যে *'আল্লাহতায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'* চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক জনাব আবদূন নূর সাহেবের উল্লেখিত বইতে নামাজের উপকারিতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিয়ে নামাজকে মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্যে খুবই উপকারী বলে উল্লেখ করেছেন। ইদানিং চিকিৎসা শাস্ত্রের এক গবেষণা সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, শেষ রাত্রি থেকে মানুষের শরীরে রক্তের Density বেড়ে যায় বলে সকাল ৮টার মধ্যে 'Heart attack এর Risk দেখা দেয় এবং উহা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। ঐ সময়ে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকলে মরণব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সুবহে্ সাদিকের বিশুদ্ধ বায়ূ শরীর ও মনকে সতেজ করে। কাবা শরীফ দুনিয়াতে সবচেয়ে পবিত্রতম ঘর। এর অপর নাম বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর। ইহা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা

www.pathagar.com

উহাকে উঠিয়ে নেবেন। কাবা শরীফের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে মুসলমানরা পৃথিবীর যে যেখানেই থাকুক না কেন উহার দিকে মুখ করেই নামাজ আদায় করতে হয়। দুনিয়ার সমস্ত মসজিদগুলি পবিত্র কাবা গৃহের অংশ বিশেষ বিধায় উহাও পবিত্র স্থান।

বর্তমান মুসলিম সমাজে মসজিদের ভূমিকা

কাবা শরীফ প্রথম আল্লাহর ঘর যা পৃথিবী সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ্ তায়ালা এই ধূলির ধরায় মানুষের জন্যে তৈরী করে দিয়েছেন। উহা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। উহা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত গৃহ। এই গৃহের কোন জৌলুস নেই। কিন্তু এই মহিমান্বিত গৃহের পবিত্রতা এবং মোহনীয় শক্তিতে মানুষ খুঁজে পায় হৃদয়-মনে অনাবিল শান্তি এবং ইহকাল ও পরকালের স্বাদ। সারা বছর ধরে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা উহার চারিদিকে তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করে ও খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ্র রহমত। এই মসজিদুল হারামে দিনে রাত্রিতে যখন পাঁচবার আযান দেয়া হয় তখন উহা শুনে অনেককে অশ্রুসিক্ত হতে দেখেছি। এক ইমামের পেছনে সব মুসলমান যাবতীয় মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে একাত্ম হয়ে আল্লাহর দরবারে নামাজ আদায় করেন। কেউ তখন মনেও আনেনা যে আমি শিয়া, আমি সুন্নী, আমি ওয়াহাবী অথবা আমি অমুক মাযহাবের বা অমুক পীরের মুরিদ। কেউ এই প্রশ্নও তোলার প্রয়োজন মনে করেনা যে, মহামান্য ইমাম সাহেব কোন্ তরিকার লোক। সবাই ধরে নেন যে, তিনি তরিকা-ই-মুহাম্মদীর লোক। এর উপর আর কোন তরিকা নেই থাকতেও পারেনা। তরিকা-ই-মুহাম্মদীই একমাত্র তরিকা যা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মুসলমানদের অপর পবিত্র মসজিদ মদীনার মসজিদে নববী। উহার পাশে শুয়ে আছেন দো-জাহানের সর্দার মহানবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। তিনি তাঁর উম্মতদের দিকে চেয়ে আছেন এবং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে চলেছেন তাঁর উম্মতদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে, গুনাহ্ মাফ করে দেয়ার জন্যে এবং জান্নাতবাসী করার জন্যে। সেই মসজিদে লক্ষ লক্ষ মুসল্লিগণ নামাজ আদায় করেন এবং নবী করিম (সঃ) এর রওজা মুবারক জেয়ারত করেন। সেখানেও মুসলমানদের কোন ভেদাভেদ নেই। মানব কল্যাণে নিবেদিত ইসলামী জীবন বিধান কল্যাণকর তা আমাদের অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনা বলেই আমাদের মধ্যে এত বিভেদ, এত ফাসাদ। দুঃখের সহিত বলতে হয় যে, এ মসজিদ নিয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরা বিভিন্ন ধরণের বিবাদে লিপ্ত এবং এ সব মনোমালিন্যে ও গোষ্ঠী স্বার্থে সংকীর্ণ

www.pathagar.com

মানসিকতাই কাজ করে। মসজিদ মুসলমানদের জন্য সার্বজনীন। কোন ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী উহার মালিকানা দাবী করতে পারেনা। উহার নামে কোন সম্পত্তি থাকলে উহা মসজিদের এক নিষ্ঠাবান খাদেম হিসেবে কড়ায় গন্ডায় মসজিদ তথা মুসল্লীদের স্বার্থে ব্যয় করতে হয়। এর ব্যতিক্রমের কোন অবকাশ নেই। ধর্মকে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করে বলেই মুসলমানরা একে অপরকে ধর্ম ব্যবসায়ী বলে গালি দেয়। এসব-রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই করে থাকে।

মসজিদ কেন্দ্রীক সমাজ

ইসলামের স্বর্ণ যুগে মসজিদ ছিল মুসলমানদের সমস্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল। সে সময় মসজিদের ইমাম ছিলেন আমিরুল মু'মিনিন। তিনি দেশের শাসনকর্তাও ছিলেন। তাঁর জবাবদিহীতা ছিল কঠোর। ইহকাল ও পরকাল দুই জায়গাতেই জবাবদিহী করতে হবে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতা তাই সর্বাধিক। এক ইমামের পিছনে অনেকগুলি লোক পিন পতন নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে এবং ইমামের আদেশমত রুকু ও সেজদায় গিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুলে করিম (সঃ) এর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ একাত্মতা প্রকাশের অনুপম সুযোগ থাকলেও বর্তমান কালের মুসলমানরা সেই প্রকার একাত্মতা ও একাগ্রতা নিয়ে নামাজ আদায় করে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আরবদেশ ব্যতিত অন্য দেশে বিশেষ করে এই উপমহাদেশে মসজিদের ইমাম নিয়ে বিতর্কের সীমা নেই।

মসজিদের ইমাম

মসজিদের ইমামগণ এখন সাধারণ বেতনভূক কর্মচারী মাত্র। রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় তাদের কোন ভূমিকা নেই। অর্থনৈতিক ভাবে তারা খুবই দূর্বল। মাদ্রাসা শিক্ষিত হয়ে বৃহত্তর আধুনিক জগৎ থেকে বেশ দূরে তাঁদের অবস্থান। ইসলামী খিলাফত যুগে ইমামগণ ইহকাল ও পরকালের দিশারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। সেই যোগ্যতা, ক্ষমতা ও ঐতিহ্য বর্তমানে ইমাম সাহেবদের নেই। যারা মসজিদের ইমাম সাহেবের বেতন-ভাতা প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন তাদের কাছে সংশ্লিষ্ট ইমাম সাহেবকে হুকুমের তাবেদার হিসেবে অনেকটা দেখা যায়। আল-কোরআন ও হাদিসের কথা নিয়োগকারীর অপছন্দনীয় হলে চাকুরী

www.pathagar.com

হারাতে হয়। এ প্রকার দূর্বলতা এবং সমস্যা নিয়ে আমাদের ইমাম সাহেবরা অতিকষ্টে কঠিন দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এ মাননীয় ব্যক্তিদের অনাকাঙ্খিত দূর্ভোগ বিশেষভাবে লক্ষনীয়। ইমাম সাহেব কোন্ পীরের অনুসারী, কোন্ তরিকত বা মাযহাবের লোক এবং কোন্ আদব আখলাক মেনে চলেন তা নিয়ে তাঁদের উপযুক্ততা যাচাই হয়। বাংলাদেশের বায়তুল মোকাররমের খতিব সহ ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ সমূহের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ প্রভাবমূক্ত মন নিয়ে চলেন এ কথা বলা যাবে না। অনেকে মসজিদের সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাবের কারণে ভারতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি গুলোর শাসন কর্তৃত্ব ভিন্ন খাতে চলে গেছে।

মসজিদ ও রাজনীতি

বর্তমান কালে মসজিদগুলি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানের অভাবে এবং বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে ধর্ম থেকে রাজনীতি আলাদা বিষয় বলে প্রচার করে থাকেন। যদি তাই হয় তবে আল-কোরআন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান হয় কিভাবে? আসলে আমরা ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে যার যার সুবিধামত ইসলামী জীবন বিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। ইহা নিছক সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম আরম্ভ হয়েছে আরবী 'লা' বা নেই শব্দ দিয়ে। তার পরেই আল্লাহ এবং রসুলে করিম (সাঃ) এর কথা বলা হয়েছে কলেমা-ই-তায়্যিবায়। আমরা অনেকেই মনে করি যে, ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলে জীবন যাপন করতে গেলে আমাদেরকে অনেক কিছুই হারাতে হবে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। বর্তমান মুসলিম সমাজে মসজিদের ভূমিকা শুধুমাত্র পরকাল কেন্দ্রীক। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা-কবর, পরকাল, বেহেস্ত, দোযখ ইত্যাদি বিষয়েই শুধু মসজিদ গুলিতে ইমামগণ আলোচনা করে থাকেন। মুসলমানদের দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে সেখানে তেমন কোন নির্দেশনামূলক আলোচনা হয়না। যদি আমরা 'হুক্কুল ইবাদ' বা বান্দাহর হক নিয়ে চিন্তা করি এবং যদি বান্দাহর সেই হক যথাযথ ভাবে আদায় করা হয় তাহলে যে কোন মুসলমান নর-নারীর কর্মজীবন এবাদতের বাইরে থাকতে পারেনা। যদি তা শরীয়ত সম্মত হয়। সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম ধর্মে আছে যে, সৎ কর্মপরায়ন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন। সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি হলো তারাই যারা মানব কল্যাণের জন্যে কাজ করে থাকেন। এই কাজের পরিধি খুবই ব্যাপক। 'হক্কুল্লাহ'

www.pathagar.com

হল আল্লাহর হক আর 'হক্কুল ইবাদ' হল বান্দাহর হক। দু'টাতেই মুসলিম নর নারীর দায়িত্ব আছে। এমতাবস্থায় মসজিদে মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের কথা যদি বলা হয়ে থাকে তবে আপত্তির কি থাকে। অবশ্য বর্তমানে শতধা বিভক্ত মুসলিম সমাজে এ কর্মসূচী খুব একটা নিরাপদ নয়। ইসলাম বিরোধী শক্তি সুকৌশলে মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে দূর্বল করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। মসজিদে মুসল্লিরা আসেন চিন্তামুক্ত হওয়ার জন্যে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় অনেক মসজিদে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়া হয়েছে "জুতা চোর হইতে সাবধান"। মসজিদে গিয়ে যদি জুতা এবং জিনিস পত্র হারাতে হয় এবং হারাবার চিন্তায় যদি উৎকণ্ঠায় থাকতে হয় তবে নিবিষ্ট মনে নামাজ আদায় করা যায় কি করে? এই কাজ করার জন্যে তো অমুসলিমরা মসজিদে আসেনা। সমাজে অপরাধ প্রবণতা কতটুকু বেড়ে গেলে এই রকম বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় তা প্রণিধান যোগ্য। অতীব দুঃখের বিষয় যে, ইহা বাংলাদেশেই চোখে পড়ে। ধর্মের আবরণে চৌর্যবৃত্তি মুসলিম সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। এর মধ্যে কেবল জুতা চোর, সিঁদেল চোরই নয় কলম চোরও আছে। অর্থাৎ কলমের আগায় যারা চুরি করে। বর্তমানে মুসলিম সমাজের ভূমিকা খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে। আশা করা যায় ইসলামের অগ্রযাত্রায় উহার যথার্থ ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন এবং বাংলাদেশ ইমাম সমিতি ও সরকারী ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ইত্যাদি কর্তৃক গৃহীত কোন কোন উদ্যোগ শুভ সূচনা বলে ধরে নেয়া হলেও তা বর্তমান কালের চাহিদা পূরণে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে বলে মনে হয়না। কারণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে গেলে যা প্রয়োজন তার অভাব রয়েছে প্রচুর।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবদের ধর্ম চর্চা

কোরআন হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে বর্তমান দুনিয়ার হাল চাল বিশেষ করে ইসলামী দুনিয়ার সামগ্রীক অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। এ জন্যে চাই প্রত্যেক মসজিদ ও মাদ্রাসা ভিত্তিক পাঠাগার। সেখানে বিভিন্ন দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা থাকবে। এতে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় আলোচনা থাকে। চলমান দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকলে শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ বোধ করবে না। দুনিয়ার কোথায় কি ঘটেছে সে সম্পর্কে মুসলমানদের অবহিত হতে হবে। না হলে মুসলমানদের এ পশ্চাদপদতা ঘূচানো যাবে না। দেশের সাধারণ মানুষ পত্র-পত্রিকার খবরাদি জানার জন্যে উদগ্রীব থাকে। কিন্তু পত্রি-পত্রিকার অভাবে জানার সে সুযোগ তাদের হয়না। সমাজপতিরা এ ব্যাপারে তৎপর হলে এ অভাব গুছে যায়। হযরত নবী করিম (সঃ) বলেছিলেন সারারাত এবাদত করার চেয়ে রাত্রে কিছুক্ষণ জ্ঞান চর্চা করা অনেক উত্তম। তিনি আরো বলেছেন শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কলমের কালি অনেক মূল্যবান। জ্ঞানের সার্বজনীনতা এখানেই ফুটে ওঠে। মানব কল্যাণে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের বিকল্প নেই। জ্ঞান বিমুখ থাকলে ইসলাম ও রাষ্ট্রের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হবেনা। ইমাম সাহেবরা অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, যদি তাঁদের আন্তরিকতা থাকে। আধুনিক জ্ঞান-বিঙ্গান চর্চার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবদের অগ্রনী হতে হবে। এ কথা সুস্পস্ট যে, ইসলাম ও বিজ্ঞান সাংঘর্ষিক নয় বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভাষাজ্ঞান

আমাদের এক শ্রেণীর আলেমদের মধ্যে ভাষার ব্যাপারে সংকীর্ণতা আছে। তারা মাতৃভাষা বাংলাকে পাত্তাই দিতে চান না। সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন যে, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা সবই আল্লাহ তায়ালার দান। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে শুরু করে পূর্ববতী সকল নবী রাসুলগণ তাঁদের মাতৃভাষায় ধর্মপ্রচার করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবীদের প্রতি তাঁদের মাতৃভাষায় অহী নাজিল হয়। এমতাবস্থায় আলেমদের মাতৃভাষার প্রতি

www.pathagar.com

বৈরী মনোভাব থাকা উচিত নয়। সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবি আবদুল হাকীম তাঁর 'বঙ্গবাণী' নামক কবিতায় লিখেছেন-

"যে সবে ধরেছ জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।"

মাতৃভাষা-মাতৃভূমি-মাতৃদূগ্ধের প্রতি মানুষের স্বভাবজাত আকর্ষণ থাকে। আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত ইমাম সাহেবরা আরবীতে ধর্মচর্চায় আগ্রহী থাকবেন এটা স্বাভাবিক। কেননা আরবী ভাষাতেই আল্ কোরআন নাজিল হয়েছে। অন্য ভাষা গুলিও আল্লাহ্র সৃষ্টি। তাই আমাদের দেশে মানুষ বুঝে মতো জুমার খোতবা আরবী থেকে অনুবাদ করে মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দিলে মানুষ আরো বেশী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং শান্তি পাবে। বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে আল-কোরআনের বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয় জনসমক্ষে তুলে ধরলে মুসলমান কেন, অমুসলিমরাও ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং আকৃষ্ট হবে। জ্ঞান অন্বেষণে আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের ভান্ডার মওজুদ রয়েছে। বেদ্বীনের ভাষা বলে যদি আমরা তা অবজ্ঞা করি তবে ওদের সমৃদ্ধ জ্ঞান থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। আমরা আবেগ দ্বারা প্রভাবিত এবং তাদের সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আমাদের এলার্জি থাকায় আমরা দূর্বল হয়ে পড়েছি। কায়েমী স্বার্থবাদীরা সেই সুযোগে আমাদের অজ্ঞ করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবদের ব্যক্তিত্ব

আরবী জানে এবং আল-কোরআন বুঝতে পারে বলেই সব মানুষ ইমাম হওয়ার যোগ্য যে হবে এমন কথা নয়। ইমাম সাহেবগণকে জ্ঞানী-গুণী এবং আধ্যাত্মিক ভাবে উচ্চ মানের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। দুনিয়া ও আখেরাতের মৌলিক উপাদান সমূহের উপর জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। যিনি ইমাম হবেন তিনি ত্যাগী হবেন, ভোগবাদী হবেন না। কারণ তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়নে দিশারী হিসেবে কাজ করবেন। তিনি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কারো কাছে কোন কিছুর জন্যে মুখাপেক্ষী হবেন না। এরূপ হলেই তাঁর ব্যক্তিত্ব অর্জিত হবে ও ইমামতির গুনাবলী অর্জিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে এবং সর্বোপরি, সবার জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারবেন। দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তদুপরি ইসলামের মূল শিক্ষা সম্পর্কে মুসলিম সমাজকে অবহিত করলে তাদের কাছে ইমাম সাহেবের পদমর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। এতে সমাজ উপকৃত হবে। ইমাম সাহেবরা অনেক সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। যৌতুক গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ-এ কথা মানুষকে বুঝিয়ে দিলে যৌতুক লোভী মানসিকতা পরিহার হবে এবং বিবাহ-শাদী ও জীবনযাত্রা সহজ হবে। যেমন- আল্ কোরআনে বর্ণিত আছে, স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা দেয়। কিন্তু বর্তমান কালে স্বামী স্ত্রীপক্ষ থেকে তা যৌতুক হিসেবে আদায় করে নেয়। অন্যথায় নির্যাতন করে। এটা যে ইসলামে নিষিদ্ধ এবং আত্মীয়তা রক্ষায় বাধাস্বরূপ ও সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য তা আমরা আধুনিকেরা ও আলেম সাহেবরা পরিস্কার করে বলতে পারিনি এবং এ ব্যাপারে সামাজিক আন্দোলনও গড়ে তোলা যায়নি। এ ধরণের সামাজিক আন্দোলন মুসলিম সমাজকে একটা মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারে। দরিদ্র পিতা মাতা এবং সংশ্লিষ্টরা দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের কন্যা সম্প্রদান প্রথা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে মুসলমানদের যে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হচ্ছে তা আমরা মোটেই অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছিনা।

সামাজিক অনুষ্ঠান

'পাছে লোকে কিছু বলে' এ ভয়ে বিবাহের সময় গরীব মেয়ের মাতা-পিতা কর্জ করে ও জমি-জমা-অলংকার বিক্রি করে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন ধরণের

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান করে। এতে কনের বুক ভাঙ্গে, মাতা-পিতার বুক ভাঙ্গে। আমরা তাদের দুঃখ বুঝতে পারিনা ইহাই আফসোস। যারা পারেন অর্থাৎ যাদের সামর্থ্য আছে তারা এত খরচ করে অনুষ্ঠান করতে পারেন বটে কিন্তু বাহ্‌বা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় জনিত অপচয় আল্লাহ্‌ তায়ালা পছন্দ করেন না। এটা আমাদের জানা থাকা আবশ্যক। অপচয় না করে আমরা তা দিয়ে অনেক গঠনমূলক কাজ তথা গরীব ছেলে মেয়ের বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করতে পারি। আরো অনেক কুসংস্কার আছে যা ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে চালু আছে। শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখিত সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের লক্ষ্যে আলেম সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠান হয় গীর্জায়। গুটি কয়েক লোকের উপস্থিতিতে বর-কনে গীর্জায় রক্ষিত বিবাহ দলিলে সই দিয়ে আসে এবং পুরোহিত বিবাহ পড়ায়ে দেন। ইসলামের মৌলিক দিকগুলি ওরাই আয়ত্ব করেছে। আর আমরা ইসলামের নাম ধারণ করে ভোগ-বিলাসে মত্ত আছি। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের ভাষায় আমরা বাংলাদেশীরা **মিসকিন** আর পাশ্চাত্যের ভাষায় Poor & Hungry ।সান ফ্রান্সিসকোর এক গীর্জায় এক খৃষ্টান যুগলের বিবাহ অনুষ্ঠান দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। বর এবং কনে দু'জনেই নাকি ধনী ঘরের ছেলেমেয়ে। বরকে দেখলাম টাই-স্যুট পরা আর কনেকে দেখলাম সাদা পোষাকে। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে নব বিবাহিত বর কনে কোন এক হোটেলে গিয়ে সীমিত সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সামান্য খানা পিনা করে নেয়-এই যা খরচ। পাশ্চাত্যের সম্প্রসারণশীল মুসলিম সমাজে এখন বিবাহ হয় Islamic Center- এ, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী। ইসলামে কার্পণ্য যেমন নিষিদ্ধ, অপব্যয়ও তেমন নিষিদ্ধ। অপচয় কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

আলেম সমাজের অনৈক্য

আমরা সাধারণ মুসলমানদের কাছে আলেম সমাজ খুবই সম্মানের পাত্র বটে। এ সুযোগে কিছু কিছু আলেম মনে করে থাকেন যে, উনারাই সর্বজ্ঞানী। আলেম শব্দের অর্থ জ্ঞানী। আমরা আধুনিক শিক্ষিতদের উনারা কোন পাত্তাই দিতে চান না বলে মনে হয়। উনাদের ইলম 'ইলমে ইলাহী' আর আমাদের ইলম 'ইলমে ইনসান' বলে ধরে নেয়া হয়। ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে আলেম সমাজের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে আলেম সমাজ নিজেরাই বিভিন্ন ভাবে শতধা বিভক্ত। আলেম সমাজ শিক্ষা নেন মাদ্রাসা থেকে। মাদ্রাসা আবার কয়েক

www.pathagar.com

প্রকারের আছে। কওমী মাদ্রাসা, সরকারী মাদ্রাসা ইত্যাদি। কওমী মাদ্রাসাকে কেউ কেউ ওয়াহাবী মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। ওরা আবার খারিজী নামেও পরিচিত। খারিজী কেন হলো তার একটা ব্যাখ্যা আছে। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান কালে আলেম সমাজ মুসলমানদেরকে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ায় একতাবদ্ধ করে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রঃ), তার পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরীরা বৃটিশ, মারাঠা এবং শিখদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। বৃটিশরা ভারত উপমহাদেশ দখল করার পর আলেম সমাজের প্রতিরোধ আন্দোলন নস্যাৎ করার লক্ষ্যে তাদের পরিচালিত মাদ্রাসা গুলোকে সরকারী সাহায্য পাওয়া থেকে খারিজ বা বঞ্চিত করে দেয়। এ থেকেই তারা খারিজি নামে পরিচিত হয়। বস্তুতঃপক্ষে আলেম সমাজ বৃটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ একশত বৎসর প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে ছিলেন এবং অসংখ্য আলেম এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁরাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। বৃটিশ, মারাঠা এবং শিখরা মুসলমানদের জীবনী শক্তিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আলেম সমাজকে টার্গেট করেছিল এবং অসংখ্য আলেম এই প্রতিরোধ যুদ্ধে অকাতরে শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে মুসলিম গণজাগরণ সে আমল থেকেই শুরু হয়। বৃটিশরা আলেমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে তাদের পছন্দমতো কিছু লোককে দলে ভিড়িয়ে কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা স্থাপন করে এবং সুকৌশলে সম্মানিত আলেম সমাজের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের বীজ বপন করে। তখন কওমী বা ওয়াহাবী মাদ্রাসাগুলো সরকারী অনুদান বা সাহায্য গ্রহণ করেনি। তারা তাদের পছন্দমতো পাঠ্য তালিকা তৈরী করে নিয়েছিল। যুগের পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে তথাকথিত ওয়াহাবী ও সরকারী মাদ্রাসা গুলি বর্তমানে তাদের সিলেবাসে কিছু কিছু পরিবর্তনের চেষ্টায় আছে বলে জানা যায়। আলেম সমাজের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ এতখানি প্রকট যে তারা একে অপরকে সহ্যই করতে চান না। সুন্নী নামে কথিত আলেমরা কওমী মাদ্রাসার শিক্ষিতদের আলেম বলেই স্বীকৃতি দিতে চান না। উল্লেখিত দুই কিসিমের আলেম এক জায়গায় বসতে পারেন না। এই দুই কিসিমের আলেমগণ তাদের প্রভাবান্বিত এলাকায় দুই ধরণের মুসলিম সমাজ তৈরীতে লিপ্ত আছেন বলে ধারণা করা যায়। ইহারই সূত্র ধরে হিংসা, হানা-হানি, বাদানুবাদ মুসলিম সমাজকে সামগ্রীক ভাবে দূর্বল করে দিচ্ছে। মুসলমানদের জন্যে ইহা এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা কখনো ইসলামে কাম্য নয়। তথাকথিত খারিজীদেরকে হযরত আলী (রাঃ) এর সময় থেকে ইসলাম ধর্মের একাংশ বলে চিহ্নিত করা হয়। নজদ

www.pathagar.com

অধিবাসী আবদুল ওয়াহাব (রঃ) এর পন্থী লোকেরাই যদি ওয়াহাবী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে তবে আরব উপদ্বীপের সব আরবদেশগুলো একই পন্থী এবং আমরা হজ্ব করতে গিয়ে ওদেরই ইমামদের পেছনে নামাজ আদায় করে থাকি। তাতে যদি আপত্তির কিছু না থাকে তবে আমরা ঐক্যের বদলে এত অনৈক্য সৃষ্টি করি কেন ও কার স্বার্থে? ঐ সব খারিজী তথা ওয়াহাবীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তবলীগ জামাত সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চলছে। দেশে বিদেশে তারা দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক খৃষ্টান ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়া ছুঁড়ি করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অপছন্দনীয় নয় কি? বাংলাদেশে প্রায় সবাই হানাফী মাযহাবের লোক এবং সুন্নী বলে পরিচিত। বৃটিশ ঐতিহাসিক William Hunter এর মতে, ওয়াহাবীরা সুন্নীদের মধ্যে একটি শুদ্ধাচার পন্থী দল বিশেষ। কিছু কিছু আলেম একে অপরকে আলেম বলেও স্বীকৃতি দিতে চাননা। এই সম্মানী ব্যক্তিরা একে অপরকে বেদায়াতী, বাতিল এবং কোন কোন সময় ফাসেক ও কাফের বলে থাকে। আমি একদিন আমার ঘরে দুই মসজিদের দুই ইমামকে দাওয়াত করে এনেছিলাম। এক ইমাম সাহেব মাহফিলে দোয়া দরূদ পড়তে আরম্ভ করলে অন্য ইমাম সাহেব উঠে চলে যান। পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তাদের ধর্মনীতি এক নয় যদিও তারা মুসলমান। একজন নিজকে সুন্নী মতাদর্শের লোক এবং অপরজন নিজকে কওমী ইমাম বলে মনে করেন। এরা ধর্মীয় সম্মেলন, তথা মিলাদ মাহ্‌ফিল, মিলাদ শরীফ, তফসীরুল কোরআন মাহফিল একত্রে করেন না, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় করেন। কোন কোন সময় পাশাপাশি জায়গায় অনুষ্ঠান করে সংঘাতে লিপ্ত হন। ওদের একাংশ তখন খুব অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। এদের একাংশের অভিযোগ হল খারিজীরা কেয়াম করেনা, দরূদ পড়েনা, মুনাজাত করে না। কিন্তু আমি তথাকথিত খারিজীদের বেশী বেশী করে দরূদ পড়তে শুনেছি এবং সংক্ষিপ্ত আকারে মুনাজাত করতে দেখেছি। বাংলাদেশের সবাই সুন্নী হানাফী মাযহাবের লোক। সেই সূত্রে সুন্নী বলে পরিচিত। আমাদের অনেক মাদ্রাসা সিনিয়র মাদ্রাসা হিসেবে সরকারী অনুদান পেয়ে থাকে। সিনিয়র শব্দটি ইংরেজী। উহার বাংলা অর্থ উচ্চ। এই উচ্চ শব্দের আরবীও আছে। কিছু ইংরেজী আর কিছু আরবী এ ধরণের পরিচিতির কি প্রয়োজন আছে? বৃটিশ আমলের সেই পরিচিতি যথাশীঘ্রই পরিবর্তন করে পুরোটাই আরবী নামে পরিচিত করণ আবশ্যক। সিলেবাসেও সমন্বিত কারিকুলাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। আশা করি আলেম সমাজ গুরুত্বের সাথে এসব বিবেচনা করবেন। এরই সাথে যুগোপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

আমরা যদি সর্বকালের সর্বাধিক প্রগতিশীল ধর্ম হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করতে না পারি তবে সেটা হবে আমাদের চরম ব্যর্থতা এবং এর খেসারত দিতে হবে সমগ্র আলেম সমাজ তথা মুসলিম সমাজকে।

কবর জিয়ারত

কবর জিয়ারত কোনভাবে বিতর্কিত হতে পারেনা, তবে কবরে গিয়ে মাল্যদান, ফুলদান, নিরবে দাঁড়িয়ে থাকা বা অন্য কোন প্রকার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান শরীয়তের পরিপন্থী কিনা তা গভীর ভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করে, ওরশের নামে শিরনী-সালাত, টাকা-পয়সা, দ্রব্য-সামগ্রী, গরু-মহিষ ইত্যাদি সংগ্রহের পন্থা ইসলাম সম্মত কিনা তা ভেবে দেখা উচিত। দরগাহ্ জিয়ারত বিধেয় হলেও সেখানে বাতি জ্বালানো, সিজদা দেওয়া ইত্যাদি ধরণের বিতর্কিত কাজ উহা অন্য ধর্মের রীতি-নীতি অনুসরণ ও শিরীক এর পর্যায়ে পড়ে। উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে অনেক দরগাহ আছে। পীর-ওলীদের দরগাহ জিয়ারত উপলক্ষে আগত ভক্তদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া, নজর-নিয়াজ ও সালামী ইত্যাদি আদায় হয় বটে। কিন্তু উহার সিংহভাগ চলে যায় সুবিধাভোগীদের পেটে। উনারা আবার অনেকে খাদেম, শাহজাদা, সর্বোপরি বাবাজান কেবলা হিসেবে পরিচিত। তারা ভক্তদেরকে অলৌকিক প্রভাবে বেহেস্ত নসীব হবে বলে ধারণা দেয়। অবশ্য আধ্যাত্মিক ভাবে সমৃদ্ধ কামেল পুরুষদের দোয়ায় অনেক সময় অলৌকিক কিছু ঘটে বটে। কিন্তু হযরত রসুলে করিম (সঃ) এর সুপারিশ ব্যতিরেকে জান্নাত নসিব দূরাশা মাত্র। কোন কোন ওরশ শরীফে নজর-নেয়াজ এত বেশী আসে যে তা বিক্রি করে ফেলতে হয়। বিক্রিলব্ধ অর্থ ভক্তদের কল্যাণে কিছুটা ব্যয়িত হলেও অধিকাংশই ব্যয় হয় খাদেমদের নিজেদেরই কল্যাণে। তার পুরো অর্থ গঠনমূলক কাজে সৎভাবে ব্যয়িত হলে মুসলিম সমাজের অনেক কল্যাণ সাধিত হতো। কিন্তু আমরা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে যতটুকু তৎপর গঠনমূলক কাজে ততটা নই।

ভিক্ষাবৃত্তি

মুসলমান সমাজেই শুধু নারী-পুরুষ-শিশু ভিখারী দেখা যায়। অন্য ধর্মে তেমন দেখা যায়না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও তো গরীব দুঃস্থ আছে। তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না কেন? কেবল মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসুল এর নাম

www.pathagar.com

নিয়ে কলমা মুখে কিছু লোক দু' পয়সা কামিয়ে নেয়ার ফিকিরে থাকে। আরব দেশে এখন ভিখারী নেই। তারা এখন ধনী। ওদের ভাষায় আমরা মিসকিন। ইউরোপ ও আমেরিকানদের দৃষ্টিতে আমরা হলাম গণদারিদ্র। আর CNN টেলিভিশনে আমাদের ছবি দেখায় অর্ধনগ্ন, মলিন এবং রোগাক্রান্ত অবস্থায়। উন্নত বিশ্বের লোকেরা তা দেখে শিউরে উঠে। তারা এন, জি,ও দের পাঠায়। এন, জি,ও দের অনেকে কুকর্ম করে নিজেদের পকেট গরম করে। মুসলমানদের আত্ম মর্যাদাবোধ কোথায় গেল? হযরত নবী করিম (সঃ) ভিক্ষা করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি খেটে খাওয়ার জন্যে বলেছেন এবং এর বাস্তব উদাহরণও দেখিয়ে গেছেন। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন- *"মনে রাখিও উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা (অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহীতার হাত অপেক্ষা) উত্তম"* (বোখারী ও মুসলিম)। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) এর দোয়া ছিল, *"হে আল্লাহ ! আমি যেমন আমার মাথাকে অন্য কারো কাছে সিজদা করা থেকে হিফাজত করেছি তদ্রুপ তুমিও আমার জবানকে অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে হিফাজত কর। আল্লাহুম্মা আমিন।"* হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, *"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়াবার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে হাত পাতে সে আসলে জাহান্নামের জ্বলন্ত কয়লা চাহিতেছে। সুতরাং যাহার ইচ্ছা বেশী চাক কিংবা কম চাক।"* (মুসলিম শরীফ) "হযরত কাবিছা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে আছে, হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, *"হাত পাতা শুধু তিন প্রকার মানুষের জন্য জায়েজ আছে। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যার কর্জ আছে, ঐ কর্জ শোধ হওয়া পরিমাণ। দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যার সমস্ত মালামাল কোন দূর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেছে, ঐ নষ্ট হওয়া মালামাল আহরণ করা পরিমাণ। তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যার অনাহারে দিন কাটে, তার জন্যেও জীবনধারণ পরিমাণ চাওয়া জায়েজ আছে। এ তিনপ্রকার ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে কেহ সাহায্য চায় সে হারাম মাল খায়।"* (মুসলিম শরীফ)। অন্য এক হাদিসে হুবুশি বিন জানাদাহ্ বলেছেন, *"হাত পাতা দুই প্রকার মানুষের জন্যে জায়েজ নেই। প্রথমতঃ স্বচ্ছল মানুষের জন্যে, দ্বিতীয়তঃ সক্ষম মানুষের জন্যে (যার উপার্জনের সামর্থ ও সুযোগ আছে)"* (তিরমিজি)। উপরোক্ত হাদিস সমূহের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, ভিক্ষাবৃত্তি একটি নিকৃষ্ট পেশা এবং একটি জঘন্য অপরাধও বটে, যার পরিণাম ফল ভয়াবহ। তবে কেন আমরা আজ ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হলাম এবং ভিক্ষুকের পর্যায়ে চলে গেলাম তা খতিয়ে দেখা উচিত।

www.pathagar.com

দাতা দেশ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঋণ ও অনুদান হিসেবে কোন্ দেশ কত সাহায্য করেছে এবং কোন্ সরকার কতটুকু তা আনতে পেরেছে সেই দক্ষতার উপর নির্ভর করে সে সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা। নিজের শক্তিতে না চলে অপরের শক্তিতে চলার অভ্যাস আমাদেরকে বহির্বিশ্বে খাটো করে রেখেছে। এ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের সিকি ভাগও যথার্থভাবে ব্যয়িত হয়েছে বলা চলেনা। সাহায্য এসেছে গরীবদের জন্যে। আর সে সাহায্য লুটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে উপর তলার লোকেরা। বৈদেশিক সাহায্য যদি সঠিক খাতে সৎ ভাবে ব্যয়িত হতো তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বিধ্বস্ত জাপান ও জার্মানীর মতো এ দেশও ঐশ্বর্য্যশালী হতে পারতো। নিউইয়র্ক শহরে আমার এক আত্মীয় আমাকে বললেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে ব্যক্তি মালিকানাধীন যে সব প্রাসাদোপম দালানাদি নির্মিত হয়েছে তা খোদ আমেরিকাতেও নেই। তিনি আক্ষেপ করে বললেন,-আমাদের দেশে নাকি গরীবের নামে টাকা এনে বড়রা সব খেয়ে ফেলে। এইতো আমাদের চরিত্র। দেশের সরকার যদি দান খয়রাতের জন্যে এতো বেশী লালায়িত থাকে এবং কাঙ্গালের মতো দাতাদেশ গুলোর কাছে ধর্ণা দিতে থাকে, তবে উহার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়তে বাধ্য এবং ভিক্ষার মানসিকতা ও পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের স্বভাবের অংশ হতে বাধ্য।

যাকাত ফিতরা ও দান খয়রাত

আল্লাহ তায়ালা সম্পদের উপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করেছেন। ইহাই যাকাত। সম্পদের যাকাত দিলে সম্পদ নিরাপদ থাকে। অনেক মুসলিম দেশে সরকারী যাকাত তহবিল আছে। জনসাধারণ সরকারের হাতে টাকা দিতে খুব আগ্রহী নয়, কারণ সরকার পরিচালনায় যারা আছেন তারা নামে মুসলিম হলেও খোদাভীরু নয় বলে ধারণা করা হয়। দেশে ইসলামী শরীয়ত মতে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালিত হলে পরিকল্পিত উপায়ে অনেক গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব। এতে বাজারে অর্থ সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে, বেকার সমস্যার সমাধান বাড়বে, বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং যাকাত প্রাপকদের স্বার্থ সংরক্ষণ হবে ও দারিদ্রতা দূরিভূত হবে। এর জন্যে চাই সততা। যা একমাত্র তাকওয়া বা খোদা ভীতির মাধ্যমেই আসতে পারে। ঈদুল ফিতরে জনপ্রতি

www.pathagar.com

ফিত্‌রা দেওয়ার বিধান দুঃস্থলোকদের অনেক উপকারে আসে। দানের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা হাত পেতে কিছু চাইতে লজ্জা পায়। কিন্তু অভাবে আছে। তাদের চেহারা দেখে, তাদের অভাব অনটনের কথা বিবেচনা করে গোপনে বা প্রকাশ্যে কেউ যদি তাদের সাহায্য দিয়ে থাকেন তবে আল্লাহতায়ালা খুবই সন্তুষ্ট হন এবং উহা কর্জে হাসানা হিসেবে গণ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ কর্জ স্বয়ং আল্লাহ্‌কেই দেয়া হলো। সুতরাং তিনি এর উপযুক্ত প্রতিদান অবশ্যই দেবেন এবং উহা হবে শতগুণে বেশী। দান যদি সু-পাত্রে হয় তবে উহার ফজিলত কত বেশী তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এতে প্রাপকের হৃদয় মনে এবং চেহারায় ফুটে ওঠে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। আপনিতেই দোয়া বেরিয়ে আসে মন থেকে। দাতার মনেও সু-পাত্রে দানের কারণে প্রফুল্লতা আসে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, তোমাকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তুমি সৎপথে ব্যয় কর। অভাবীদের অভাব মোছন কর। সাদ্‌কা হলো ভিন্ন ধরণের। উহা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। বিপদ আপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যাপার ছাড়াও আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যাঁরা দান সাদ্‌কা করেন তাতেও অনেক উপকার সাধিত হয়। শিক্ষা বিস্তার, রাস্তা ঘাট সংস্কার, পুল নির্মাণ, ঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে সুপরিচিতি। তার সওয়াব অনাদি কাল পর্যন্ত জারি থাকবে। এতিম মিসকিনদের ভরণ পোষন, রুগ্ন, অসহায় ও ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য এবং পথিকদের সাহায্যে ব্যয় এই সবের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। উন্নত বিশ্বে এবং আরব বিশ্বে দান খয়রাত করার লোক দশজন আর নেবার লোক একজন। আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছেন যারা ধর্মের নামে যাকাত, ফিত্‌রা, দান, খয়রাত, সাদকা, দেবার জন্যে জনসাধারণকে উৎসাহিত করেন এবং এক দিলে দশ হবে আশ্বস্থ করেন। অথচ এহেন উপকারী কাজ থেকে উনারা নিজেরাই বিরত থাকেন এবং এ ধরণের ভাল কাজে উনাদের চর্চা নেই বললেই চলে। এর কারণ কি? উনারা কি দিবার মতো সামর্থ রাখেননা নাকি তাতে অভ্যস্ত নন? উনারা একজন লোককে মাজার শরীফ ও পীর সাহেবের আস্তানায় নজর নিয়াজ দেয়ার জন্যে উৎসাহ দেন এবং দান খয়রাতের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন তথা ধন বৃদ্ধির কথা বলেন। অথচ এত ফজিলতের কাজে উনারা নিজেরাই শরীক হননা কেন? অন্যজন দিলে যদি ফজিলত পাওয়া যায় তবে নিজে দিলেও তো তাই হবে। এমতাবস্থায় উনারা তা থেকে বিরত থাকেন কেন? আর সব সময় উনারা গ্রহীতা হবেন আর অন্যরা দাতা হবেন এটাতো মানায় না। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, *"মনে রাখিও উপরের হাত নীচের*

www.pathagar.com

হাত অপেক্ষা (অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহীতার হাত অপেক্ষা) উত্তম।" এছাড়া এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। উনারা ইশারা-ইংগিতে নিজেদেরকে দিতে বলেন যদিও উনাদের চেয়ে পাবার উপযুক্ত লোক অনেক আছে। এতে করে এসব সম্মানিত লোকেরা ভদ্রবেশে ভিক্ষুকের পর্যায়ে চলে যান। ফলে ধর্মীয় এবং সামাজিক ভাবে উনাদের মর্যাদা কমে যায়। উনারা হলেন শিরোমণি। ইলমে ইলাহী উনাদের হৃদয়ে। উনারা কারো চেয়ে ছোট নন। উনাদের চাওয়া লাগেনা। উনাদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেয়া মুসলিম সমাজের নৈতিক দায়িত্ব। উনারা কোরআন এবং হাদিসের মর্মবাণী জনসাধারণের কাছে খোলাসা করে উপস্থাপন করলেই হয়। চট্টগ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে, তা হলো-

"তোঁয়ার বাড়ীত ব'অন ভোজন
তোঁয়ার পূণ্যর লাই,
ব'অনর বাড়ীত তোঁয়ার ভোজন
তাতে পূণ্য নাই।"

এর মর্মার্থ হলো- কোন ব্রাহ্মনকে বাড়ীতে খাওয়ালে পূণ্য আছে কিন্তু ব্রাহ্মনের বাড়ীতে ভোজনে কারও পূণ্য হবে না? এতে করে অতি সূক্ষ ভাবে খাওয়ানোর দায় হতে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে অব্যহতি দেওয়া হলো। অর্থ্যাৎ একতরফা ভাবে ব্রাহ্মনদেরকেই শুধু অব্রাহ্মণদের বাড়ীতে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো। এ ভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অপব্যবহার শুধু হিন্দু সমাজে নয় বরং তা পর্যায়ক্রমে মুসলিম সমাজকেও গ্রাস করেছে। যাকাত-ফিতরা ও দান-খয়রাত-সাদকাহ্ ভিখারী-সৃষ্টির জন্যে নয় কিংবা ভিক্ষা বৃত্তিকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভিক্ষা বৃত্তি এখন অনেকের পেশায় পরিণত হয়েছে। অনেকে ভিক্ষালব্ধ টাকা লগ্নি করে গোপনে অনেক বিত্তশালী হয়ে গেছে কিন্তু বাইরে ভিখারীর বেশ ধরে ভিক্ষা করে। এ ব্যাপারে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, *"শুধু তিন প্রকার মানুষের জন্যে হাত পাতার অবকাশ আছে। প্রথমতঃ ক্ষুধায় মৃত্যু আশংকা দেখা দিয়েছে এমন ব্যক্তি, দ্বিতীয়তঃ ঋণভারে জর্জরিত ব্যক্তি এবং তৃতীয়তঃ কোন মর্মান্তিক রক্তপণের ফাঁসে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তি।"* হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) আরো বলেছেন, *"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়াবার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে হাত পাতে সে আসলে জাহান্নামের জলন্ত কয়লা চাহিতেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা বেশী চাক কিংবা কম চাক (দ্রষ্টব্যঃ ফাজায়েলে সাদাকাত)।"*

www.pathagar.com

আমরা যদি বলি যে, গরীব থাকা ভাল এবং গরীবদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন তবে তা হবে ইসলামের অপব্যাখ্যা। আমরা অনেকেই দাতা সাজার জন্যে ভিক্ষা গ্রহণকারীদেরকে লাইনে দাঁড়িয়ে যাকাত ভিক্ষা গ্রহণ করতে বলি। এতে দাতা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করার মানসিকতা প্রকাশ পায় এবং গরীবদের স্বাবলম্বী হবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যাকাত এমন ভাবে আল-কোরআনের নির্দিষ্ট খাতে আদায় করতে হবে যাতে করে সে লোকেরা স্বাবলম্বী হয়ে পরবর্তীতে আর ভিক্ষা ও যাকাত নিতে না হয়। পশ্চিমা অনেক দেশে এবং আমেরিকাতেও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে বেকার ভাতা দেয়া হয়। কিন্তু খুব প্রয়োজন না হলে কেউ তা গ্রহণ করতে চায়না। কারণ এতে মর্যাদা হানি হয়। পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া এলাকায় বান্দরবান সড়কের পার্শ্বে ভিখারী ও দুঃস্থদের জন্যে বায়তুল ইজ্জত নামে একটি বিরাট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হয়। ইহা বর্তমানে বি, ডি, আর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আমাদের এক শ্রেণীর লোক ভিক্ষা বৃত্তিকে পেশা হিসেবে নিয়ে থাকে। এতে কোন পুঁজিও লাগেনা, শ্রমও লাগেনা। বিকলাঙ্গ ও দুঃস্থদের অনেককে এক ধরণের হীন চরিত্রের ব্যবসায়ী ভিক্ষা বৃত্তিতে নিয়োজিত রেখে তাদের কাছ থেকে মার্জিন আদায় করে। ভিখারী যা পায় তা মালিককে জমা দিতে হবে। মালিক তার খুশিমতো ভিখারী পরিবারকে কিছু দিয়ে থাকে। রাস্তাঘাটে এবং বিভিন্ন স্থানে যেসব ভিখারীকে ভিক্ষা করতে দেখা যায় তাদের সবাই অভাবের কারণে ভিক্ষা করে এমন নয়। তারা এটাকে পেশা হিসেবে নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে। আমাদের সমাজপতিরা কিংবা সরকার এদিকে মনযোগ দেয়ার ফুরসতও পান না। কারণ তাদের অধিকাংশই ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকেন। কবির ভাষায় বলতে হয়-

"এই জগতে হায় সেই বেশী চায়
আছে যার ভুরি ভুরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত
কাঙ্গালের ধন চুরি।"

আমাদের দেশে যে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কাঠামো চালু আছে তাতে দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের হক সাফ কাপড় ওয়ালারাদের বিভিন্ন কায়দায় গ্রাস করার এবং তা নিজেদের ভোগ বিলাসে ব্যয় করার ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামের অপব্যাখ্যার কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা ভিক্ষা বৃত্তিতে বেশী উৎসাহিত হয়। গরীব লোক সব ধর্মেই আছে। ওদের মধ্যে ভিখারীর সংখ্যা খুব কম। আমাদের মধ্যে

www.pathagar.com

বেশী। তার একমাত্র কারণ আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় কোন পরিকল্পনা নেই এবং আমাদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মসম্মান বোধের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনেককে পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করে। মুসলিম জাতিকে আরো বেশী আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত হতে হবে। আমাদের দেশ বৈদেশিক ঋণভারে জর্জরিত। আমাদের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে বর্তমানে বিদেশী ভিন্নধর্মী এন, জি,ও রা গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি করেছে। গরীব লোকদেরকে বিভিন্ন লোভ লালসার দ্বারা বশীভূত করে তাদের ধর্ম বিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছে এবং আমাদের জাতি সত্বার বিনাশ ঘটাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি সরকারী ভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত। তবে এর আগে সরকারকে অবশ্যই দুঃস্থ এবং অসহায়দের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। এটা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। যারা এটা নিয়ে রাজনীতি করে তারা হীনমানসিকতা সম্পন্ন। রাজনীতি ও ধর্মকে কলুসিত না করে মানবতার খাতিরে মানবিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

ইসলামের বুনিয়াদী পাঁচ স্তম্ভ

ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত এই পাঁচ মৌলিক ভিত্তির উপরে ইসলামের অবস্থান। সূরা আল-বাকারার প্রথম আয়াতেই মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। যারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে রাসূল করীম (সঃ) এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে বলে বিশ্বাস করে তারাই মুসলিম। এ আয়াতে সালাত বা নামাজ কায়েম করা এবং আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে তাঁর পথে খরচ করার কথা বলা হয়েছে। একই সূরাতে হজ্ব জাকাত ও রমজানের রোজার কথাও বর্ণিত আছে। রোজ কিয়ামতে যারা বিশ্বাস করে তারাই বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে পূনরুত্থানে বিশ্বাস করে।

www.pathagar.com

সালাম দেওয়া নেওয়া

আলমে আরওয়াহা অর্থ্যাৎ রূহ জগৎ এর সৃষ্টি থেকে সালামের উৎপত্তি বলে বলা হয়ে থাকে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং ফিরিস্তরা হযরত নবী করীম (সঃ) কে সালাম দেয়ার কথা আল-কোরআনে উল্লেখ আছে। মুসলমানেরা একে অপরকে কিভাবে সালাম দেবে বা নেবে তার একটা পদ্ধতি আছে। আমরা মুসলমানেরা সালামের মৌলিকত্ব থেকে অনেক দূরে সরে গেছি এবং ইহা অনেকটা লৌকিকতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। সমাজে যারা অর্থবিত্ত ও পদমর্যাদায় শক্তিশালী তাদের সালাম দিয়ে অথবা কদমবুচি করে সম্মান দেখাতে হবে। অফিস আদালতে যারা ক্ষমতাধর তাদেরকে অধীনস্থদের সম্মান দেখানোর পদ্ধতি হিসেবে সালামটুকু দিতেই হয়। না হলে বেয়াদবী মনে করা হয়। কর্তারা অনেকেই সালাম পেয়ে ইশারা ইংগিতে জবাব দিতেও বিরত থাকেন। যদিও ইশারা ইংগিতে জবাব দেবার কোন বিধান ইসলামে নেই। সালাম দেওয়া নেওয়াতে এখন ধর্মীয় অনুভূতি ও দায়িত্ব বোধের প্রশ্ন গৌণ। সব ধর্মে কুশল বিনিময়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি চালু আছে। হিন্দুদের পদ্ধতি হলো-প্রণাম, নমস্কার, নমস্তে, আদাব বলা । ওরা ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদের প্রণাম করে দু'হাত জোড় করে নমস্কার, নমস্তে ও আদাব বলে। খৃষ্টানেরা এক্ষেত্রে গুড মর্ণিং, গুড নূন, গুড ইভেনিং, গুড নাইট ইত্যাদি বলে থাকে। ইদানিং আমেরিকায় হাই, হাউ আর ইউ, হাউ ডু ইউ ডু, উত্তরে-ফাইন, যাবার সময়-বাই বাই ইত্যাদি বলা হয়। এতে উভয় পক্ষে ইস্পিত হাস্যের ভাব থাকে। বৌদ্ধরাও অনেকটা হিন্দুদের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। মুসলমানদের পদ্ধতি তা থেকে ভিন্ন। মুসলমানদের সালাম দেওয়া নেওয়াতে পারস্পরিক কল্যাণ কামনার বিষয় সম্পৃক্ত আছে। যেমন-আচ্ছালামু আলাইকুম। (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক), উত্তরে-ওয়ালাইকুমুস সালাম (আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হউক)। প্রশ্ন আসে এই শান্তি কোথা থেকে কিভাবে আসবে। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে শান্তি বর্ষণের কথাই এখানে বলা হয়েছে। শান্তি একমাত্র আল্লাহতায়ালাই দিতে পারেন, এটাই হল মর্মকথা। আমি আপনাকে দেখা মাত্র বল্লাম-আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক)। এর উত্তরে আপনি বললেন- ওয়ালাইকুমুস সালাম (আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হউক) এতে করে একে অপরের জন্য বিশ্ব-বিধাতা আল্লাহর কাছে শান্তি চাওয়া হল। আল্লাহর বিধান মতে মুসলমানদের পারস্পরিক কুশল বিনিময় পদ্ধতি অতুলনীয়। আমি অন্য ধর্মের সাথে এর তুলনা করতে চাই না। যার যার ধর্ম তার

www.pathagar.com

জন্যে। এভাবে সালাম দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে একে অপরের সাথে খুব ঘনিষ্ট হওয়া যায়। আত্মার মিলন হয়। এতে আল্লাহ্ তায়ালা খুশী হন। ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করে নেন। আমাদের দেশে বর্তমানে সালাম দেওয়া নেওয়াতে আন্তরিকতা আছে বলে মনে হয়না। উহা অনেকটা লৌকিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। সালামকে এখন উদ্দেশ্যগতভাবে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়, যেমন- রাজনৈতিক সালাম, ব্যবসায়িক সালাম, মনিব-ভৃত্য সালাম, মালিক-কর্মচারী সালাম, ছাত্র-শিক্ষক সালাম, লাল সালাম ইত্যাদি। আরো বহু প্রকারের সালাম আছে। এ সবগুলিই মতলবী সালাম। সালাম যিনি দেন তিনি ইসলামী দর্শনে বড়। বড় হতে হলে ছোট হতে হয়। একটা কথা আছে *"বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।"* সালাম যিনি দেন তিনি নিশ্চয়ই ছোট নন। আরব বিশ্বে ছোট বড় প্রশ্ন নেই। কে কার আগে সালাম দেয়ার সুযোগ নেবে এটাই তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি। আমরা যারা আধুনিক বলে নিজেদেরকে দাবী করি এবং আলেম সমাজ যারা ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে ওয়াকিবহাল বলে ধারণা করে থাকেন তারা এবং আমরা সালাম দেয়ার চেয়েও পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব থাকি বেশী। এই যদি রেওয়াজ হয় তবে আমরা হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মনদের পর্যায়ে চলে যাব। ব্রাহ্মনেরা অন্য কোন শ্রেণী কিংবা বর্ণের লোকদেরকে নমস্কার প্রদান কিংবা তাদের পদধূলি গ্রহণ করতে পারেন না। তারা অন্য হিন্দুদের কাছ থেকে নমস্কার পাওয়ার এবং তাদেরকে পদধূলি দানের অধিকার সংরক্ষিত রাখেন। ইহা একপ্রকার ব্যক্তিপূজা। সাম্যের জয়গান গেয়ে যে ইসলামের আবির্ভাব সে ইসলামের অনুসারীদের নীতি ও আদর্শ বর্তমানে প্রতিমা পূজায় না হলেও বড়দের পূজায় নিবেদিত। এই যদি সালাম দেওয়া নেওয়ার উদ্দেশ্য ও অবস্থা হয়ে থাকে তবে বর্ণ প্রথা, শ্রেণী প্রথা যা ইসলামে নিষিদ্ধ তাই আমাদের পেয়ে বসেছে বলে ধরে নিতে হবে। আমাদের জ্ঞানের স্বল্প পরিসরে সব কথা বলা সম্ভব নয়। তবে মুসলমানদের চিন্তার জগতে চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে জরুরী কিছু কথা বলা হলো। আশাকরি বিষয়টি যথার্থভাবে বিবেচিত হবে এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আলোকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে মানবতার উন্মেষ ঘটাতে সহায়ক হবে। পীর সাহেবদের উচ্ছিষ্ট কুলির পানি খাওয়া ও তাদের আঙ্গুল চোষা ইত্যাদি দ্বারা ভক্তরা কি ফজিলত লাভ করেন তা বোধগম্য নয়। ভক্তির মাত্রা ও ধরণ এরূপ হবার কোন বিধান ইসলামী শরীয়তে আছে বলে আমার জানা নেই। উহা এতটুকু পর্যায়ে যাওয়া আদৌ শরীয়ত সম্মত কিনা তা আমাদের সকলের ভেবে দেখা উচিত। প্রকৃত আলেমে দ্বীন ও পীর মাশায়েখগণ যারা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন তারা কোন সময়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেন না। ইবাদত বন্দেগীর ধরণ ও প্রকৃতি কি এবং

www.pathagar.com

উহা কাজে-কর্মে, চিন্তা-চেতনায় প্রকাশ করার ব্যাপারে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা অবশ্যই কর্তব্য। সম্মান প্রদর্শনের জন্যে হযরত রাসুলে করীম (সঃ) এবং পয়গাম্বরদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই হতেও পারেনা। নবী-রাসুলগণের অধিকাংশই আরব ভূ-খন্ডে প্রেরিত হন। আরব দেশে বাংলাদেশের মত যত্র তত্র এত মাজার নেই এবং এ রকমের ছিলছিলাও সেখানে দেখা যায়না। হযরত নবী করিম (সঃ) এর রওজা মোবারকে যদি নজর নিয়াজের ব্যবস্থা থাকতো তবে ভক্তরা অভাবনীয়ভাবে অর্থবিত্ত দিয়ে সওয়াব হাসিলের চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেখানে দেখেছি শুধু অশ্রু সজল নয়নে লক্ষ কোটি লোকের হাত উত্তোলিত মুনাজাত।

বাস্তববাদী হওয়া আবশ্যক

বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষক, ছিন্নমূল লোক, ভাসমান জনগোষ্ঠী, টোকাই এবং এরশাদ সাহেবের পথকলির সংখ্যা দিন দিন আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধির দিকে। ওদের দিয়ে সভা সমিতি করা যায়, ভোট আসলে ওদের দিয়ে জাল ভোটেরও ব্যবস্থা করা যায়। তন্ত্র মন্ত্র ওদের প্রয়োজন নেই। যখন যা তখন তা এই নীতিতেই ওরা বিশ্বাসী। কাজেই ভাঙ্গার জন্যে ওরাই যথেষ্ট। আধুনিক শিক্ষিতরা ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর্শ ও নীতির টোপ গিলাতে পারেন না। ওদের ঝাড়, ফুক, দোজখ ও কবরের ভয় দেখিয়ে পারবেন না। ওরা লাভ-ক্ষতি বুঝে। দুনিয়ায় ওদের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে সময় মত বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করতে না পারলে ওরা সমাজ বিরোধী, ধর্মবিরোধী, সন্ত্রাসী, নষ্ট ও দুষ্টদের হাতে চলে যাবে। তখন আঘাত আসবে। মনে রাখতে হবে খারাপ লোকদেরকে এক ডাকে রাত নিশীতেও একত্রিত করা যায় কিন্তু ভাল লোকদেরকে ভালকাজে দশবার ডেকেও একত্রিত করা যায় না। সময় থাকতেই উপর ওয়ালারা সাবধান হোন আর না হলে ওরা আর চেয়ে নেবেনা কেড়েই নিয়ে যাবে। মুসলমানদেরকে হাত পাতার মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। এটা ইসলাম বিরোধী। নেবার পর্যায় থেকে সর্বক্ষেত্রে দেবার পর্যায়ে যেতে হবে। নইলে মহান ইসলামের অবমাননা হবে। সত্যিকার মুসলিম গরীব হতে পারেনা। মুসলিম সমাজের দূর্বলতা বুঝে এন, জি, ও নামে বিদেশী কতক সংস্থা বিভিন্ন নামে উপনিবেশ গড়ে তোলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে প্রশাসন হাত করার প্রয়াসে লিপ্ত আছে। যে ভাবে বৃটিশ আমলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা করতে এসে ভারত বর্ষে আধিপত্য বিস্তার করে প্রায় দুইশত বৎসর যাবত

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। আলেম সমাজ বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। সময় থাকতেই আমাদের সাবধান হওয়া আবশ্যক।

মুসলমানদের জীবন প্রণালী

মুসলমানদের জীবন প্রণালী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইসলামের স্বর্ণ যুগের জীবন প্রণালী ও আজকের জীবন প্রণালীর মধ্যে অনেক তফাত। সেই তফাত বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একদিকে অপচয়, অপব্যয়, অন্য দিকে ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা। এটি আমাদের সমাজ জীবনের একটি খন্ডচিত্র। যে ধর্মের মূলমন্ত্র সাম্য এবং ন্যায় বিচার, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সে ধর্মের মানুষ একালে বৈষম্যের অতল গহবরে নিমজ্জিত। হযরত নবী করিম (সঃ) থেকে আরম্ভ করে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) জীবন কাল পর্যন্ত মুসলমানদের জীবন ছিল অতি সহজ ও সরল। খানা পিনা ও পোষাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সবকিছুই ছিল অতি সাধারণ তথা সাদা মাঠা। পরবর্তীকালে ইসলামে রাজতন্ত্র ও অভিজাত তন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। ফলে মুসলমানদের চারিত্রিক গুণাবলী লোপ পেতে থাকে। তাদের জীবন হয়ে পড়ে ভোগ সর্বস্ব এবং তাদের মধ্যে ত্যাগের কোন বালাই নেই। বাংলাদেশের মুসলমানরা ভুলে গেছে যে তাদের এককালে যে নবাবী হাল ছিল এখন আর নেই। এদেশের মানুষের অন্তত ৭০% ভাগই দীনদুঃখী। তারা বিত্তহীন হলেও স্বভাব কিন্তু আগের মতই রয়ে গেছে। তরি তরকারী দিয়ে ডাল ভাত খাওয়া তাদের অনেকের পছন্দ হয় না। মাছ গোস্ত পয়সায় না কুলালেও কিনে। এত অভাব অনটন তারপরও কিনে। সাধারণ পরিবারের একজন মুসলিম একশত টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে প্রথম চোটেই ৭০/৮০ টাকা দিয়ে এক কেজি গরুর গোস্ত, না হয় মুরগী অথবা খাসির গোস্ত কিনে ফেলে। এতে অবস্থাটা কি দাঁড়ালো ? ভদ্র লোকের অন্য বাজারতো হলোই না। ঘরে গিয়ে গৃহকর্ত্রীর বকাবকি। এ ব্যাপারে হিন্দু সমাজের জীবন প্রণালী কিন্তু অনেকটা বাস্তব ভিত্তিক। ওরা একশত টাকা নিয়ে বাজারে গেলে তরি তরকারী শাকের ডাটা ইত্যাদি ৫/৭ কেজি কিনে সাথে কিছু ডাল কিছু সরিষা কিনে আনে। এতে ঘরে গেলে বকাবকি শুনার ঝুঁকি থাকে কম। ডাল ভাতের খাওয়াও ভাল হলো, স্বাস্থ্যও ঠিক থাকলো, মাথাটাও ঠান্ডা থাকলো। অন্যদিকে চর্বি ওয়ালা গোস্ত খেয়ে মুসলিম ভদ্রলোক কিছুদিন পরে হয়তো হৃদরোগে না হয় অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে অথবা ক্লিনিকে ভর্তি হয়। আর টাকা থাকলে ঢাকার সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে অথবা সিঙ্গাপুর-কলিকাতায় নিয়ে যায়। এ হলো

www.pathagar.com

মুসলমানদের অবস্থা। স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে মুসলমানরা বেশীর ভাগই অমনোযোগী এবং উদাসীন। মুসলমানরা এখনো বাদশাহী কায়দায় জৌলুস প্রিয় রয়ে গেছে। অবস্থাসম্পন্ন মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের বিয়েতে জোড়ার অনুষ্ঠান, মেহেদী অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠান, বৌ-ভাত ইত্যাদি ধরণের আরো কত অনুষ্ঠান করে থাকে। এ ভাবে চলে খানা-পিনার বিভিন্ন আয়োজন। সহস্র আলোক সজ্জা- নেই ঘুম, নেই বিশ্রাম। দুই পক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষ যদি একটু আর্থিকভাবে দুর্বল হয় তবে তাঁর ভোগান্তির শেষ থাকেনা। শেষ কালে পরিণতি হয় রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী অথবা মৃত্যুবরণ। এতসব করা হয় আমোদ আহ্লাদের জন্যে ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। অথ্যাৎ আমি পারি আমার আছে। এধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় প্রায় শহরাঞ্চলেই। যেখানে পয়সা ওয়ালারা বাস করে। পাড়া-গ্রামের লোকেরা এখন বৎসরে একবারও মেজবানের দাওয়াত পায় না। অথচ শহরে একজনের দিনে তিন চারটা দাওয়াত থাকে। গ্রামে আগের দিনে যে প্রাণচাঞ্চল্য ছিল তা এখন আর নেই বললেই চলে। যা আছে সব টেলিভিশনেই। গ্রামের বঞ্চিত লোকেরা এখন মিয়া বাড়ীতে কিংবা জমিদার বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার প্রশ্নই উঠেনা। কারণ সব অনুষ্ঠানই এখন শহরের বিভিন্ন ক্লাবে ও হলে চলে এসেছে। এ যেন গ্রামের বঞ্চিত মানুষের আজিকার ভাগ্যলিপি। এ কারণে শহরে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি কমিউনিটি সেন্টার, হোটেল, রেস্তোঁরা ইত্যাদি। এখন আর আগের দিনের পাটি ও চাঁটাই'র বৈঠক নেই। ঐতিহ্যবাহী দস্তরখানাও নেই। এ সবের স্থান দখল করে নিয়েছে তথাকথিত আধুনিকতা। আগের দিনে আশ্বিন/কার্তিক মাসে গ্রামের বিত্তবানরা মেজবান দিতো। সংখ্যালঘুরা নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করতো। এরই সুবাদে গ্রামের গরীবেরা কিছু খাওয়ার সুযোগ পেত। কিন্তু এখনকার দিনে মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে গ্রামের এ সব অনুষ্ঠান কমে গেছে। বৌদ্ধদের যা আছে সেটাও হলো বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান। সংখ্যালঘুরা এখন আর কলা পাতার উপর ভোজন এর আয়োজন করেন না। তারা এখন চেয়ার টেবিলে বাসন কোসন এর ব্যবস্থা করেন। মুসলমানদের এককালে অর্থবিত্ত ও প্রাচুর্য ছিল। বাংলাদেশে তাদের কেউ পেশায় নাপিত-ধোপার কাজ করে না। রাজা বাদশাহর মানসিকতা মুসলমানদের পরিহার করতে হবে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নাপিত-ধোপার কাজ থেকে আরম্ভ করে সব ধরনের বৈধ কাজ করতে হবে। গরীবি এখন মুসলমানদের দোর গোড়ায় শুধু নয়, রান্না ঘরেও ঠাঁই নিয়েছে। মনে রাখতে হবে শ্রম এবং শ্রমিকের মর্যাদা সবার উপরে। হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের শিক্ষাও এটাই। উপোস থাকার চেয়ে নাপিত-ধোপা এবং প্রয়োজনে তার চেয়েও নিম্ন

www.pathagar.com

মানের বৈধ কাজ করতে কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়। আজকাল শহুরে আত্মীয়দের দাওয়াতে গ্রামের আত্মীয়রা আসতে চায়না। তার প্রধান কারণ হলো শহরে আসার মতো তাদের ভাল কাপড় চোপড় থাকেনা। আসা-যাওয়ার জন্যে খরচের টাকা থাকেনা। এটা শতকরা ৭০% ভাগ ক্ষেত্রেই সত্য। ইউরোপ আমেরিকা এবং উন্নত বিশ্বে নাপিত, ধোপা, মুচি, মেথর তাদের মধ্য থেকেই হয়। তারাতো ঐসব করার জন্যে বাইর থেকে লোক আনেনা। মুসলমানদের এ জীবন পদ্ধতি অবশ্যই বদলাতে হবে। সহজ সরল এবং কম খরচে জীবন যাপন পদ্ধতি অবশ্যই এস্তেমাল করতে হবে। আলেম সমাজকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ গ্রামের সাধারণ লোকের উপর তাদের প্রভাবই বেশী থাকে। হালে কোন কোন বিদেশী এন, জি, ও সহজ সরল গ্রাম বাসীদেরকে নৈরাজ্য, অনৈতিকতা ও অন্য ধর্মের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা খুব কম সময়ের মধ্যে পয়সা ওয়ালা হওয়ায় তাদের মধ্যে সমস্যা বেড়েছে। দেশের টাকা বাইরে নিয়ে অমুসলিম লোকদের সাথে মিশে তারা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হতে চলেছে। তারা পানির মতো টাকা খরচ করে ফুর্তি করে। তাদের ইসলামী মূল্যবোধ তথা ঐক্যবোধ খুব একটা আছে বলে মনে হয়না। ওরা বাইরে যতটা ইসলামী ভাব দেখায় বাস্তবে ততটা নয়। তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা পেয়ে আমাদের একশ্রেণীর লোক এদেশে যেভাবে ইসলামকে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাতে তাদের খুব বেশী আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞা আছে বলে মনে হয়না। সামান্য আঘাত আসলেই ওরা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। কারণ এরা ফেরকা বাজীতে অভ্যস্ত এবং তারা এটাকে ব্যবসায় পরিণত করেছে। অমুসলিম শক্তিগুলো এটাই চায়। পরাশক্তি গুলি মুসলমানদের মধ্যে জীবনী শক্তির সঞ্চার হোক তা চায়না। ওরা বাহিরে যা দেখায় তার সবই কৃত্রিম। অনেকটা নিচে ঘা রেখে উপরে প্রলেপ দেয়ার মতোই। চেতনা ও মূল্যবোধ বিনষ্টের চক্রান্তে পশ্চিমা দেশগুলিতে টাকা পয়সার অভাব নেই বলে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগামী বা জ্ঞান অন্বেষণে অনুরাগী বলে ইসলামের দিকে ক্রমাগত ঝুঁকে পড়ছে। তুরস্কে ইসলামিক ওয়েল ফেয়ারপার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। সেখানে টাই স্যুট পরা পুরুষ এবং মিনি স্কার্ট পরা ও ববকাট চুল ওয়ালা মহিলারা ইসলাম পন্থীদের ভোট দিয়েছে। তারা ইসলামকে কে চিনতে পেরেছে। আমাদের দেশে ইসলামকে জানার জন্যে লেখাপড়ার চর্চা খুবই কম। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ব্যাপারে লেখাপড়ার চর্চা আরো বাড়াতে হবে। না হয় আমাদের অবস্থা শোচনীয় হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

নারী জাতির জন্যে পর্দা তাদেরকে গৃহবন্দী করা কিংবা তাদের অধিকার হরণ করা নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুরুষরাও ঘরের দরজা জানালায় পর্দা লাগায়। পর্দা হলো পরিচ্ছেদ বিশেষ। কোমল দ্রব্য, সুস্বাদু ফল ইত্যাদির বাইরে আবরণ থাকে। উহা এক প্রকার আচ্ছাদন। এভাবে যে সমস্ত জিনিস কোমল ও সুস্বাদু সে সমস্ত জিনিসের কোন না কোন আচ্ছাদন থাকতেই হয়। ইহা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। নারী দেহের কোন অঙ্গ যথাযথ ভাবে ঢাকা থাকলে তাদের নিরাপত্তা এবং সৌন্দর্য বাড়ে এবং তাতে তাদের মর্যাদাও বাড়ে। পর পুরুষদের প্রলুব্ধ করার মতো নারীরা চললে তাদের বিপদও আছে। সেজন্যে সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রমনীয়তা রক্ষার তাগিদে নারী দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ঢাকা থাকার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পর্দা মনের ভিতরের বিষয়, এটা মেনে নিয়েও নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, নারীরা নিজেদের স্বার্থে শান্তি ও নিরাপত্তা তদুপরি রমনীয়তা ও কমনীয়তা রক্ষার তাগিদে শরীরের কোন কোন বিশেষ অঙ্গে আচ্ছাদন দিয়ে চলার মধ্যে তাদের জন্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এ উপলব্ধি পর্দা প্রথার অহেতুক ভীতি থেকে তাদেরকে পরিত্রাণ দেবে। বেশী আচ্ছাদন বা অপ্রয়োজনীয় কাপড় জড়ানোর নাম পর্দা নয়। মেয়েদেরকে ঘরে আটকিয়ে রাখা কিংবা তাদেরকে জীবিকা উপার্জন তথা শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি ধরণের অন্যান্য কাজ কর্মে বাধা প্রদান করা পর্দা নয়। ইজ্জত আবরু রক্ষা করে উপরোক্ত কাজ করতে নারীদের জন্যে কোন বাধা থাকতে পারেনা। ইদানিং বিভিন্ন দেশে মুসলিম নারীরাও যোদ্ধা বেশে স্বাধীকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদেরকে অকর্মণ্য করে রেখে একক ভাবে পুরুষের সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি তুলে ধরা হলো-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি ও চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর ।

আল কোরআনের বাণী হলো-*'নারী ও পুরুষ একে অপরের আচ্ছাদন (পরিচ্ছদ) স্বরূপ।'* নারী জাতিকে অকর্মণ্য করে রাখলে বিপদ আসতে পারে। তারা প্রয়োজন মাফিক ঘরে-বাহিরে কর্মরত থাকলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। পারিবারিক দৈন্যতা হ্রাস পাবে। আবার নারীদের জন্যে সব কাজ মানায় না এবং সব কাজ করতে গেলে ঝুঁকিও আছে। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র যন্ত্রকে অবশ্যই এসব ব্যাপার গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে হবে এবং নারীদের জন্যে যথোপযুক্ত সম্মানজনক ও নিরাপদ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

বহু বিবাহ

ইসলাম ধর্মে অনুর্ধ্ব চারজন স্ত্রী এক সঙ্গে রাখার বিধান আছে। তাই বলে তার অপব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ। বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা এবং সর্বোপরি, সব স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহারের ব্যবস্থা ছাড়া একাধিক বিবাহ ক্ষতিকর এবং তা কোরআনেও বারণ করা হয়েছে, এতে পরিবারে অযথা সংকট সৃষ্টি হয়। আর গৃহকর্তার শারীরিক শক্তি কমতে থাকলে এ সংকট আরো ঘনিভূত হয়। নিজের যৌন উশৃঙ্খলতা চরিতার্থ করার জন্যে বহু বিবাহ একটি গর্হিত কাজ। ইহা ইসলামে নিষিদ্ধ। বৈধ বিবাহ বন্ধন ব্যতিত অন্য নারীর সহিত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন ব্যভিচার ব্যতিত কিছুই নয়। নারীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পশ্চিমা জগতে দৈহিক লালসা চরিতার্থ করার জন্যে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যৌনাচার এবং এমন কি পিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষণের কথাও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়। এ প্রকার যৌনাচার তথা যৌন স্বাধীনতা মানব সমাজকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যাবে। ইসলামে নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনে ভারসাম্য রক্ষা করার বিধান অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত। নারী কর্তৃক একাধিক স্বামী গ্রহণের বিধান ধর্মে নেই। ইদানিং তথাকথিত নারীবাদী তসলিমা নাসরিন গং একাধিক স্বামী গ্রহণের দাবী তুলেছে। তার কথা মতো এক রমণীর একাধিক স্বামী থাকলে পরিবার প্রথা আর থাকবেনা। Family Values সমাজ জীবনের একটি মেরুদন্ড। এর বিলোপ হলে মানব সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হবে। ইদানিং অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ কারণে বহু বিবাহ প্রথা মুসলিম সমাজে কমে আসছে। বিত্তবানরাই শুধু বহু বিবাহের কথা চিন্তা করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অনেক দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের গাত্র দাহ শুরু হয়েছে। অবশ্য একদিকে বহু সন্তান অপরপক্ষে কম সম্পদ মুছিবত হিসাবে চিহ্নিত হতে শুরু হয়েছে। তৎসম্পর্কে একটি হাদিসও আছে, -হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন- *'আল্লাহর দরবারে পানাহ চাও বিপদ আপদের কষ্ট থেকে, গরিবী অবস্থা থেকে, অমঙ্গল ফায়সালা থেকে, এবং দুশমনের দুশমনি থেকে।'* উল্লেখিত হাদিস শরীফের (জুহুদিল বালা অংশের) তফসির করতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সন্তান সন্ততির আধিক্য ও সম্পদের স্বল্পতা ইহার অন্তর্ভূক্ত। তাঁর মুনাজাত ছিল- *"হে আল্লাহ! যে অধিক সন্তান সন্ততির দ্বারা কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে তা থেকে আপনার দরবারে পানাহ চাই।"*-মিশকাত শরীফ।

www.pathagar.com

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও জন্ম শাসন

এর পক্ষে বিপক্ষে বহু যুক্তি আছে। ইসলামের দোহাই দিয়ে ভাল মন্দ বিচার বিবেচনা না করে লাগামহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে বেসামাল অবস্থার সৃষ্টি করা কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমি অন্যকে পৃথিবীতে আসার জন্যে বাধার সৃষ্টি করবো এটা যেমন ঠিক নয় তেমনি আবার বেপরোয়া সন্তান জন্মদান পারিবারিক শান্তি বিনাশের কারণ ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্যেরও ক্ষতিসাধন করে। এ কথা সত্যি যে, রিজিকের মালিক রাজ্জাক। তা মেনে নিয়েও বলা যায় বিবেক বুদ্ধি মতো চলার তাগিদও ইসলামে আছে। বাংলাদেশ ও ভারত জনসংখ্যার ভারে নূয়ে পড়ার উপক্রম। পরিবার পরিকল্পনা খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বাস্তব প্রয়োগ আছে বলে মনে হয়না। আমরা কেউ আল্লাহর কাছে আদর্শ পরিবার চাই না। কায়মনোবাক্যে চাইলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কাকেও বিপদ মুছিবতের সম্মুখীন করেন না এটা নিশ্চিত। আল্লাহতা'লা মানুষকে বুদ্ধিমান জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের পূর্বে বিবাহ না করার কথা আছে পাক কোরআনে।

তালাক

তালাক তিন প্রকার আছে। বিবাহ্ যেমন কয়েক প্রকার আছে তালাকও কয়েক প্রকার আছে। এসব তালাক সম্পর্কে মুসলমানদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিলে ভাল হয়। এক সাথে তিন তালাক দেওয়া যায় কিন্তু অবস্থা ভেদে এক সাথে না দিয়ে তিন তোহ্রে তিন বার দেওয়া উত্তম। এক তালাকের পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলে ঐ তালাক আর থাকেনা। অবশিষ্ট দুই তালাকের উপর বৈবাহিক সম্পর্ক অটল থাকে। অথবা এক তোহ্রে একবার এক তালাক উচ্চারণ করে যদি ইদ্দত সময়কাল পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সহবাস না হয় তবে ঐ তালাকও কার্যকর হবেনা। এ প্রকার সময়ের ব্যবধানে তালাক দেয়ার কথা জানা থাকলে অনেকে একসাথে তিন তালাক দিতনা। তালাকে হাছানা, তালাকে আহ্ছান ও তালাকে বিদায়াত-এ তিন প্রকার তালাকের মধ্যে তালাকে বিদায়াত হলো চরমপন্থী। ইসলাম চরমপন্থা সমর্থন করে না। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তালাক অপছন্দনীয়। তিনি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও শান্তি চান। বিভেদ কলহ্ চান না। তবে বিভিন্ন কারণে বিবাহ্ বিচ্ছেদ যদি একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তবে উহার ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে রাখার কথা বলা হয়েছে যেন উহার অপব্যবহার না হয়। আল্লাহ্

www.pathagar.com

তায়ালার বিধি বিধানে সর্বাবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। যারা নারী স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন উশৃঙ্খলতার শ্লোগান দেয় এবং নারী-পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তারা মূলতঃ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনকে অস্বীকার করতে চায়। প্রাক ইসলামী যুগে এমন কি বর্তমান কালেও পিতা-মাতা স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন প্রভৃতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সুষম বন্টনের ইনসাফ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন ব্যবস্থা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে নেই। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে নারীদেরকে সম মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে অনেকেই অনেক কথা বলতে পারেন। তবে তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিধি বিধান ব্যতিত অন্য সব ক্ষেত্রে ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্র মতে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অনেক কিছু যুগোপযোগী করে নিতে কোন বাধা নেই। ইসলাম ধর্মের সার্বজনীনতা এখানেই।

আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতা

ইসলামে চেতনা শক্তি হ্রাস করে এবং নেশা সৃষ্টি করে এমন কাজ বা অনুষ্ঠানের বিধান নেই। কারণ নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির ভালমন্দ বিচার করার মতো কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকেনা। ইসলামে 'অতি' বলে কিছু নেই। ত্যাগই ইসলামের মূল শিক্ষা বিধায় ভোগের যে কোন প্রকার আয়োজন ইসলামে নিরুৎসাহিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে নিষিদ্ধ বটে। মদ, গাঁজা, হিরোইন, আফিম, ফেন্সিডিল ইত্যাদি ধরণের সব কিছু চেতনা শক্তির বিলোপ ঘটায় বিধায় পাশবিক কার্যকলাপ রোধে এসবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে ইসলামের উপযোগিতা জেল খানার কয়েদীরাও উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। বিশ্বের সেরা মুষ্টিযোদ্ধা মাইক টাইসন কারা বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নাম পরিবর্তন করে মালিক আবদুল আজিজ নাম ধারণ করেছেন। ইংল্যান্ডের এক জেলখানায় সাড়ে তিনশ কয়েদীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উপর গত ২৭শে আগষ্ট ১৯৯৬ইং তারিখে প্রচারিত টেলিভিশনের বি, বি, সি-২ চ্যানেলের একটি প্রোগ্রামের বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ- ইংল্যান্ডের কয়েদ খানায় একটি সেলের মধ্যে তিনশত খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। বিস্তারিত রিপোর্টে জানা যায় ইমাম মুরাদ উদ্দীন নামক একজন মুসলমান অন্যান্য খৃষ্টানের সাথে একই কারাগারে আটক ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে খৃষ্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। একজন দু'জন করে মানুষ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হতে শুরু করে। বর্তমানে ঐ জেলে নওমুসলিমের সংখ্যা সাড়ে তিনশ। ঐ সব

www.pathagar.com

নওমুসলিমেরা জেলের ভিতরে লাইব্রেরীকে অন্যত্র সরিয়ে লাইব্রেরী ঘরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। ওখানে প্রতিদিন আজান দিয়ে জামায়াতের সহিত নামাজ আদায় করা হয় এবং প্রতি নামাজের পরে ধর্মীয় আলোচনা হয়ে থাকে। ইমাম মুরাদ উদ্দীন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে করে ওদের মন থেকে সমস্ত খারাপ কাজের চিন্তা দূর হয়ে যায়। রিপোর্ট দেখে মনে হল ইমাম সাহেব এতে সফল হচ্ছেন। রিপোর্টার একজন নও মুসলিমকে জিজ্ঞেস করলেন-আপনার মুসলমান হবার পেছনে কোন কারণ ছিল কি? অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঐ মুসলমান জবাবে বললেন, আমাদের জীবনে কোন শান্তি ছিলনা। বিভিন্ন ভাবে শান্তি খুঁজতে লাগলাম। শান্তি পাবার জন্যে চার্চে গেলাম, শান্তি পেলাম না। মদ-গাঁজা খেলাম, অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়লাম, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলাম না, বরং আসলাম কারাগারে। এখানে এসেই খুঁজে পেলাম সেই প্রত্যাশিত শান্তির ঠিকানা। জানতে পারলাম আমি কে? কেন আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে? তাই মুরাদ উদ্দীন আমাদেরকে কালিমা পড়ায়ে মুসলমান করেন। এখন আমি নিয়মিত নামাজ পড়ি ও কোরআন তিলাওয়াত করি। যখন আমি কোরআন পড়ি তখন মনে হয় যেন কোরআনের প্রতিটি আয়াত আমার জীবনের এক একটি সমস্যার সমাধান, আর নামাজে দাঁড়ালে মনে হয় যেন আমি পরম শান্তিতে মায়ের কোলে শুয়ে আছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামে আমি খুঁজে পেয়েছি প্রত্যাশিত শান্তি। রিপোর্টার অন্য একজন নও মুসলিমকে জিজ্ঞেস করেন আপনারা মুসলমান হবার ফলে আপনাদের সমাজ বা পরিবারে এর কোন প্রতিক্রিয়া হবে কিনা? এর জবাবে ঐ নও মুসলিম বলেন,- হয়ত পরিবার ও সমাজের লোক আমাদেরকে গ্রহণ নাও করতে পারে। যদি ওরা আমাদেরকে গ্রহণ না করে তাহলে আমাদের কিছুই করণীয় নেই। এই পরিবার ও সমাজ আমাদেরকে শান্তি দিতে পারেনি। শেষ বিচারের কঠিন শাস্তি থেকেও রক্ষা করতে পারবেনা। আমার মুক্তির পথ আমাকেই খুঁজতে হবে। যখন আমি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি তখন কেউ বাধা দিলে তাকে মানব কেন? ইসলামকে জানতে না পারাটাই হলো জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। জীবনের এই প্রান্ত সীমায় এসে ইহাই আমার উপলব্ধি যে, ইসলামের জন্যে আমি নই বরং আমার জন্যেই ইসলাম। ইংল্যান্ডের জেলখানায় সে কয়েদিটি আরো বললেন, আমি আগে নিজকে চিনতে পারিনি, ইসলামে এসেই নিজকে চিনতে পেরেছি। ইসলামের শিক্ষা ভোগ বিলাস নয়। ভোগ বিলাস কলুষতার জন্ম দেয়। আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতে গিয়ে অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দূর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে যায়। নিজের সামর্থ্যের বাইরে চলতে গেলে নিজের পুঁজি পাট্টা ও

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ শেষ করতে হবে। নয়ত অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় অর্থবিত্ত উপার্জন করতে হবে।

অবৈধ আয়

সংসার জীবনের প্রারম্ভে আমরা অনেকেই অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করে দেখেছি এতে কারো কোন লাভ হয়নি বরং ক্ষতিই হয়েছে। যখন অবৈধ পন্থায় পয়সা আসে তখন ভালই লাগে। এ যে কোন কালে ক্ষতির কারণ হবে তা আমরা অনেকেই ভেবে দেখিনা। পরবর্তীতে যোগ বিয়োগ করে দেখা যায় এতে ক্ষতি ব্যতিত কোন লাভই হয়নি এবং ঐ টাকাতে কোন বরকতও নেই। সৎ পথে যারা জীবিকা উপার্জন করে তাদেরকে আল্লাহ্ কোন না কোন ভাবে সাহায্য করেন। আল্লাহ তায়ালার মদদ বা সাহায্য কিভাবে আসবে তা কেউ বলতে পারেনা। কয়েক বছর আগে ইসলামপন্থী কিছু ছেলে আমাকে জানালো যে তাদের এলাকায় রমজান মাসে এক হোটেলওয়ালা হোটেল খোলা রেখেছে তাকে অনুরোধ করলেও সে হোটেল বন্ধ রাখে না। ছেলেদের বিশ্বাস যে আমি বললে হোটেলওয়ালা দিনের বেলায় হোটেল বন্ধ রাখবে। আমি ছেলেদেরকে বললাম তোমরা আরো তিনদিন হোটেলওয়ালাকে বলে দেখ। ইসলামপন্থী ঐ ছেলেগুলি মুসলিম হোটেল ওয়ালাকে এও বলেছিল যে হারাম পথে উপার্জন তার ও তার পরিবারের জন্যে শান্তি আনবে না। কয়দিন পর ঐ ছেলেগুলি আমাকে জানালো যে হোটেল আর দিনের বেলায় চলছে না। মালিক তাদেরকে বলেছে যে মালিকের অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে মালিক ঢাকায় যাচ্ছে। সত্যি সত্যি রমজান মাসে দিনের বেলায় হোটেল খোলা রেখে মালিক যে আয় করেছে তাতে তার জন্য শান্তি আসেনি বরং অশান্তিই এসেছে। অনেক সময় দেখা যায়, পিতার সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ তার এক ছেলে নষ্ট করে দিয়েছে বা পিতা-মাতার মান-ইজ্জত, খ্যাতি এক কন্যাই নষ্ট করে দিয়েছে অথবা সংসারের কোন একজনই সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছে। মান-ইজ্জত, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ সবই আল্লাহ তায়ালাই দিয়ে থাকেন। তিনি আবার বেইজ্জতও করতে পারেন, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ সবই কেড়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী পাওনা দিয়ে থাকেন। তিনি কারো প্রতি কোন অবিচার করেন না। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এত নিয়ামত দিয়েছেন কিন্তু আমরা তাতে শোকর আদায় করি না। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে, একদিন এক ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ) কে বললেন তিনি যেন তুর পর্বতে আল্লাহ্‌র সাথে দেখা হলে তাকে যেন আর ধন সম্পদ না দেয়ার জন্যে বলেন। কারণ তিনি নাকি

www.pathagar.com

বেশী পেয়ে গেছেন। হযরত মূসা (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালা বললেন যে আমার দেয়া রিজিক ও ধন সম্পদ পেয়ে যে ব্যক্তি শোকর আদায় করে তাকে তিনি আরো বাড়িয়ে দেন। লোকটি মূসা (আঃ) এর নিকট আবার গিয়ে জানতে পারলেন যে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে লোকটির ফরিয়াদ জানানো হয়েছে। তখন লোকটির কাছে একটি আপেল ছিল, লোকটি বলেছিলেন, এইটি আল্লাহ্র নিয়ামত, এ নিয়ামতের শোকর আদায় করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সাথে সাথেই আপেলটি একটি স্বর্ণ পিন্ডে পরিণত হয়ে গেল। আরেক ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ) কে বললেন যে, তার কপাল কেন মন্দ তা যেন মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তায়ালাকে জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন যে, আমার নিয়ামতের শোকর গুজার করেনা আমি তার কাছ থেকে সবকিছুই কেড়ে নিই। মূসা (আঃ) এ কথা লোকটিকে বলার পর লোকটি বললেন, আমার কিছুই নেই আমি কিসের শোকর গুজার করবো? তখন হঠাৎ একটি ঘূর্ণিপাক এসে লোকটির গায়ের চাদরটি উড়াইয়া নিয়ে গেলো। এভাবে যারা আল্লাহ্ তায়ালার শোকর গুজার করেনা তাদের কাছে যা আছে তাও আল্লাহ্ তায়ালা বিভিন্ন ভাবে নিয়ে নেন। আমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস করছি তারা আল্লাহ্র শোকর গুজারী না করে কোন উপায় নেই। কারণ তিনি চোখের পলকেই প্রলয়কান্ড ঘটিয়ে দিতে পারেন। কেউ বুঝতেও পারবেনা যে কোন কালে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত ভূ-খন্ডে কোন মানব বসতি ছিল। এ ধরণের কাহিনী আল্লাহতায়ালা আল্ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। যেমন-সূরা আর রাহমানে বার বার এ কথাই বলা হয়েছে যেঃ "(হে মানুষ ও জ্বিন) ! তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পার" । মানব জাতিকে সদর্পে ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মানুষের দিকে মুখ বিকৃত করোনা, মাটির উপর দর্প ভরে হেঁটো না, কারণ আল্লাহ্ উদ্ধত আর অহংকারীদের ভালবাসেন না। নিচু স্বরে কথা বলো। গাধার কন্ঠস্বর-ই সবচেয়ে কর্কশ (আল্-কোরআন)। (১৮-১৯)

www.pathagar.com

পোষাক-পরিচ্ছদ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বিভিন্ন ধরণের কাপড়-চোপড় পরে থাকে। কারণ প্রয়োজন ও রুচিবোধ সব দেশে এক নয়। রকমারী, জাঁকজমকপূর্ণ ও মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষের মধ্যে অহমিকা সৃষ্টি করতে পারে। মুসলিম নারী-পুরুষের পোষাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই ধর্মীয় নীতিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ। আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে-

"বহু মূল্য পরিচ্ছদ বসন ও ভূষণ
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্ধন"

সাদাসিদে ও রুচিসম্মত পোষাক-পরিচ্ছদ কম খরচেও তৈরী করা যায়। মুসলমানদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইসলামে ভোগ বিলাসের অবকাশ নেই। খরচ বাড়ালে অনেক সময় অর্থ যোগানের জন্য পাপ কাজে লিপ্ত হতে হয়। এ কারণেই অপব্যয় ও অপচয়কে আল্ কোরআনে গর্হিত কাজ বলা হয়েছে। অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান

মুসলমানদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা ফরজ। আমাদের দেশে মুসলমানদের শতকরা ষাট থেকে সত্তর ভাগই নিরক্ষর। মুসলমানদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা ফরজ। খৃষ্টানদের মধ্যে কোন নিরক্ষর নেই। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা দুই একজন আছে। 'ইকরা' (পড়) দিয়ে যে ধর্মের বিধান শুরু সে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার এত বেশী যে তা খুবই লজ্জার কথা। হযরত নবী করিম (সঃ) বলেছেন-জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। ইদানিং অবশ্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে আধুনিক শিক্ষা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে আমাদের ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতরা মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে শিক্ষিত বলে স্বীকৃতি দিতে চাননা। তেমনি ভাবে আরবী শিক্ষিতদের অনেকেই ইংরেজী শিক্ষিতদেরকে কুশিক্ষিত বলে মনে করে থাকেন। এ দু'এর মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় থাকতে হবে। এর কোনটাই পরিত্যাজ্য নয়। হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) একদা বলেছিলেন,- "জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রয়োজন হলে তোমরা সুদূর চীন পর্যন্ত যাও।" চীনে তখন কোন ইসলাম শিক্ষা ছিলনা।

www.pathagar.com

এতেই বুঝা যায় জ্ঞান অর্জনের জন্যে কোন নির্ধারিত পরিমন্ডল নেই। এর পরিধি অপরিসীম। আধুনিক শিক্ষাতে আছে শক্তি, মাদ্রাসা শিক্ষাতে আছে ভক্তি, এ দুই এর মিলিত শক্তিতে মুসলিম উম্মাহ্‌র হবে মুক্তি। হাদিস শরীফে আরো বলা হয়েছে, রাতে কিছুক্ষণ জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। অবশ্য এ জ্ঞান চর্চা কোন অবৈধ ও অনৈসলামী উদ্দেশ্যে হলে হাদিসের উপরোক্ত বাণী প্রযোজ্য হবেনা। মুসলমানদের উপর আলেম সমাজের প্রভাব বেশী। আলেম সমাজ যদি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকেন তবে আমরা চিরকালই পাশ্চাত্যের পিছনে পড়ে থাকবো। মুসলমানদের উদ্ভাবিত হেকিমী শাস্ত্র এবং হিন্দুদের উদ্ভাবিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে উৎকর্ষতা সাধন করেছিল তা এখন পাশ্চাত্যের এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও বায়োক্যামিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে প্রতিযোগিতায় অনেক পিছনে পড়ে আছে। গত কয়েক বছরে দেশে হাজার হাজার ফার্মেসী ও ক্লিনিক হয়েছে। এ সব ফার্মেসী ও ক্লিনিক গুলির সবই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ফসল। আমরা প্রায় সে চিকিৎসাই গ্রহণ করি। আমাদের আল্লামারা কি এ সব দেখেও দেখেন না? আমরা ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুদেরকে গালি দিলে কি হবে তারাতো জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে আছে। কলিকাতায় এক পত্রিকায় জনৈক মন্তব্য করেছেন, মুসলমানরা পেছনে পড়ে থাকার কারণ হলো তারা ধর্মীয় গ্রন্থ্‌ আল্‌ কোরআন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আমি অনেক আলেমকে দেখেছি যারা তাদের মেয়ের জামাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তথা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হলে অনেক বেশী খুশী হন। তাদের ছেলেমেয়েদের অনেককেও দেখা যায় তারা পাশ্চাত্যের জীবন যাপন পদ্ধতির অনেকটা অনুসারী। অর্থনৈতিক ও নৈতিক দূর্বলতার কারণে এ অবস্থা হয়েছে বলা যায়। বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃটিশরা এদেশে দু' ধরণের শিক্ষা প্রকল্প তৈরী করে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে উহা এখনো সে ভাবেই চলছে। আমাদের দেশে মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে যতটা না পার্থক্য তার চেয়েও বেশী পার্থক্য ওয়াহাবী-ছুন্নী ও শিয়া-ছুন্নীর মধ্যে। ইহাই কি তরিকা-ই মুহাম্মদীয়া? আমরা সবাই আত্ম প্রচারণায় রত আছি। মুসলিম উম্মাহ্‌র দূর্বলতা এখানেই। আমরা অনেকেই নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ধর্মের লেবাসে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার সৃষ্টি করে কায়েমী স্বার্থ উদ্ধার ও রক্ষা করে চলছি। আমাদের আলেম সমাজের অনেকেই বাংলা ভাষার প্রতি ভাল ধারণা রাখেন না। অথচ সব ভাষা এসেছে আল্লাহতায়ালার দেয়া শিক্ষা থেকে। আমাদেরকে গোমরাহী এতটুকু পেয়ে বসেছে যে, আমরা দেশী-বিদেশী দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বইয়ের

www.pathagar.com

সাথে কোন সম্পর্ক রাখিনা। ফলে চলমান দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দুনিয়াকে বাদ দিয়ে শুধু দ্বীনের কথা বলেই চলা যাবে না। দ্বীন দুনিয়া উভয়ই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অঙ্গ। ইহুদী-খৃষ্টান তারা বেদ্বীন ঠিকই কিন্তু ওরা যে দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাদের খারাপ ও নৈতিকতা বর্জিত ঘৃণ্য আচার-আচরণ এবং কলুষিত জীবন পদ্ধতির দিকটা বাদ দিলে ভাল দিকটা গ্রহণে আপত্তি কেন এবং বাধা কোথায়? ফরাসী মনিষী ডঃ মরিস বুকাইলির মতে-'আল কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বিজ্ঞানের ক্রম বিকাশ ও আবিষ্কারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর কোরআন, বিজ্ঞান ও বাইবেল, গ্রন্থে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- কোরআনের কোন আয়াত বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং বাইবেলের সাথেই বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অনেক বিষয় আছে। জ্ঞান অর্জন করা মুসলমানদের জন্যে ফরজ। ইসলামী সমাজ গঠনে ঐশী ও দুনিয়াবী জ্ঞানের অধিকারী হতে পারলেই ইহকাল ও পরকালে আমরা সাফল্য লাভ করতে পারবো।

মুসলিম পরিচয়

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মুসলিম পরিচয়টা কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর ভারতীয় হিন্দু উদ্রবাদীদের দ্বারা সংগঠিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলাকালে এক মুসলিম সরকারী কর্মকর্তা বলেছিলেন, মুসলিম হয়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করাটাই তার এবং তার পরিবারের জন্যে অভিশাপ। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের কোন কোন অঞ্চলে মুসলিম পরিচিতি ব্যতিত জীবনযাপন করা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল আর এখন সেখানে মুসলিম পরিচয় বহন করাই ঝুঁকিপূর্ণ। মাত্র পাঁচ দশকের মধ্যে ভারতে মুসলমানরা অর্থবিত্তে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়ে পড়েছে। এমন কি বর্তমানে বাংলাদেশেও কোন কোন অঞ্চলে মুসলিম পরিচয় বহন করা অন্য সম্পাদায়ের লোকদের অপেক্ষা অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ। অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশে মুসলিম পরিচিতি নিয়ে এমিগ্রেশন ভিসা পাওয়া কষ্টকর। গতবার হজ্বে গেলে একজন অস্ট্রেলিয় মুসলিম আমাকে জানান যে তিনি খৃস্টান নাম ধারণ না করলে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করার অনুমতি পেতেন না। তিনি যদি মুসলিম পরিচিতি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাবার আবেদন করতেন তবে তার আবেদন নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হতো। আমাদের দেশে অনেক এন, জি, ও বর্তমানে এ কাজই করছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিরোধী অপতৎপরতা চলা সত্বেও ইসলামের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার শক্তি ও

www.pathagar.com

ক্ষমতা কারো নেই বলে আমার বিশ্বাস। বাংলাদেশে দারিদ্রতা ও ঈমানের সংকট এন, জি,ও দের এ কাজকে সহজ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও যে কোন শর্তে যেখানে পায় সেখান থেকে সাহায্য চায় বলে অনেক এন, জি, ও এ অপকর্ম চালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে। কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন সম্প্রদায়ের লোক তা চিনার মতো কি ব্যবস্থা আছে ? যদি বলা হয় যে, দাঁড়ি। তবে দাঁড়িতো শিখদেরও আছে, বহু হিন্দুদেরও আছে, খৃস্টানদেরও আছে, ইহুদীদেরও আছে এবং অনেক নাস্তিকেরও আছে। যদি বলা হয় যে, টুপি' তবে কংগ্রেস নেতাদের যারা হিন্দু তাদের তো টুপি আছে। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ সহ নেপাল ও ভুটানের লোকেরাও টুপি পরে। ইসলামের মর্মকথা হলো মানুষের সাম্য ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস। কোরআন সুন্নাহর শিক্ষা যাদের অন্তরে আছে তাদেরকে চেনা যাবেই। কোন না কোন ভাবে তাদের চেহারা সুরতে তা প্রতিফলিত হবেই। আচার-আচরণে, স্বভাব-চরিত্রে, চাল-চলনে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠবেই। যদি এসব গুনাবলীর দৈন্যতা থাকে তবে চিনা যাবে কিভাবে ? বাহ্যিক আবরণের দ্বারা মুসলিম নারী-পুরুষের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন আলেম সমাজের লম্বা জামা এবং পাগড়ি একইভাবে আরবদেরকেও তাদের ভূষণে মুসলমান বলে আঁচ করতে তেমন কষ্ট করতে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন আরবাকান, বসনীয়ার প্রেসিডেন্ট আলিজা ইজ্জত বেগভিচ এবং চেচনিয়ার মরহুম নেতা জওহর দুদায়েভ তাঁরাতো ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুসারী লোক। তুরস্কের নাজিম উদ্দিন আরবাকানের দল 'ইসলামিক ওয়েল ফেয়ার পার্টি'কে ভোট দিয়েছে মিনি স্কার্ট পরা মহিলারা এবং ক্লিন সেভ ও টাই-কোট পরা পুরুষেরা। ইসলামের প্রতি তাদের আসক্তি বিশ্ব সমাজে ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানের কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ক্লিন সেভ ছিলেন কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে তিনি কি না করে গেছেন? একই ভাবে আল্লামা ইকবাল সহ আরো অনেকেই যাঁদের অন্তরে ইসলামের জ্যোতি সদা বিরাজমান ছিল তাঁদেরকে কোন ভাবে পরিচয় করা কষ্টকর বিষয় নয়। একজন মুসলমান যদি সত্যিকার অর্থেই মুসলমান হন তবে তাকে মুসলমান বলে পরিচয় করে নেয়া কষ্টকর হবেনা। যদি তার অন্তরে ঈমানী জ্যোতি তথা তাকওয়ার প্রভাব বিদ্যমান থাকে তবে তা থেকে নূরানী ঝলক বেরিয়ে আসবেই। ইসলামের পাঁচ ফরজ আদায়ের মধ্যে মুসলিম অমুসলিমের তারতম্য অবশ্যই ধরা পড়বে। এছাড়া একজন মুসলমানের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি কদম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এখানেই মুসলিম অমুসলিম পার্থক্য। তবে মুসলিম কি অমুসলিম এটা ফারাক করে নেয়ার জন্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

www.pathagar.com

মুসলমানদের মুখে দাঁড়ি মানানসই হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বৃদ্ধ কালে দাঁড়ি না রাখলে অনেকের চেহারা নাকি বানর বা হনুমানের মত দেখায়। কারণ বার্ধক্যের একটা সৌন্দর্য আছে। দাঁড়ি সৌন্দর্যের অংশ বিশেষ। দাঁড়ি টুপি সর্বক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুস জীবনের মানদন্ড নয়। অনেকে দাঁড়ি টুপি নিয়েও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিপরীতে চলেন এবং বিতর্কিত হন। দাঁড়ি টুপি রাখতে হলে যথেষ্ট মনোবলের প্রয়োজন আছে। সেটা কবে কিভাবে আসবে তা সময়ের প্রশ্ন মাত্র। আমি অনেককেই বার্ধক্যে আক্ষেপ করতে শুনেছি যে, তারা দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পরকালের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করেননি। এটা খুবই আফসোসের বিষয়।

পেশাগত সততা

একজন মুসলিম শিক্ষক বা পেশাজীবির চাইতে একজন অমুসলিম শিক্ষক বা পেশাজীবি অনেকটা ভাল বলে ধারণা করা হয়। এতে সত্যতা নেই বলে বলা যায়না। পেশাগত সততা যদি স্বভাব চরিত্রে না থাকে তবে তিনি মুসলিম বা অমুসলিম যেই হোন, তা হবে নামে মাত্র। ইসলামের শিক্ষা কিন্তু তা নয়। পেশাগত যোগ্যতা অর্জন ধর্মীয় বিশ্বাসের মাপকাঠিও বটে। কারণ জ্ঞান বিস্তার এবং প্রসারের জন্যে আন্তরিকতার প্রয়োজন। একজন মুসলিম ও অমুসলিম ডাক্তার একই সাথে বিদেশে থেকে একই ডিগ্রী নিয়ে যার যার দেশে ফিরলে তাদের পেশাগত দক্ষতার তারতম্য ঘটে। দেখা যায় কোন কোন রোগের ডায়গোনসিস রিপোর্ট বাংলাদেশে যা হয় বিদেশে গেলে তা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণ হবার উদাহরণ আছে। তবে প্রতিযোগিতাতো আছে এবং তা থাকবেও। এতদসত্ত্বেও বলা যায় যে, আমাদের দেশের অনেক ডাক্তাররা মন দিয়ে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করেন না। সে কারণেই আমাদের দেশের লোকেরা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে ভারত, সিংগাপুর ও লন্ডন ছুটে যেতে হয়। আমার মনে পড়ে ১৯৮৯ সালে লন্ডনে একটি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। হাসপাতালের ডাক্তাররা আমার চেক আপ এর জন্যে ৪৫ মিনিট সময় ব্যয় করেছেন। ডাক্তার সাহেবের আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা দেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে আমার সহধর্মীনির চিকিৎসা করাবার জন্যে এক সেবা মূলক হাসপাতালে গেলে কর্তব্যরত ব্যক্তি একখানা কার্ড দিয়ে জানান যে, তিন মাস পরে হাসপাতালে দেখা করার জন্যে। এতে বুঝলাম যে বৃটেন ও আমেরিকায় সেবার মানে তারতম্য আছে। বৃটেনে চিকিৎসা হয়

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় আর আমেরিকায় পয়সা ছাড়া কথাই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পয়সা আদায় করে নেয় বীমা কোম্পানী কিংবা অন্যান্য দাতা গ্রুপ থেকে।

কৌসুলী এবং প্রকৌশলীদের ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিম বিষয়ে অনেকে পার্থক্য করে থাকেন। এতে যে সত্যতা নেই তা জোর করে বলা যাবে না। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বুদ্ধিজীবিদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বুদ্ধি ও কূটনীতির গুণে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের উপর সুকৌশলে, পরিকল্পিত ভাবে, ঠান্ডা মাথায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রতিবেশী ভারত চানক্য কূটনীতির মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে অশুভ প্রভাব ও বিরোধ সৃষ্টি করে প্রভূত্ব কায়েম রাখার চেষ্টা চালায়। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান। সাবেক পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানী পণ্যের বাজার সবটুকুই দখল করে নিয়েছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। এদের সাথে যোগ দিয়েছিল এদেশের একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। ব্যবসায়ে সততার কারণে এখনও একই অবস্থাই চলছে। আমরা অনেকেই হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কেনাকেটা করে থাকি। আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই পেশাগত সততা বজায় রাখতে হবে। মুসলমানদের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং পেশাগত সততার অভাবের কারণেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আমরা মুসলমানরা অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন। এই আবেগটুকু বাদ দিলে ভাল হয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের স্বার্থ সম্পর্কে খুবই সচেতন। এটা তাদের সব কাজ কারবারে বিদ্যমান। ওদের অনেকের ভিতর বাহির এক নয় কিন্তু মুসলমানরা বিশ্বাসী সম্প্রদায় বলে কপটতা করতে পারেনা। তাই বলে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিলে চলবে না। তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ স্বরূপ তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তানসু সিলার বলেছেন, তুরস্ক মুসলিম রাষ্ট্র হওয়াতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাহলে দেখা যায়, ধর্মীয় গোষ্ঠী স্বার্থ পৃথিবীর সব জায়গায় কমবেশী বিরাজমান। শুধুমাত্র মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশী উদার। এ অর্থহীন উদারতার কোন মূল্য নেই।

www.pathagar.com

ত্যাগ ও ভোগ

মুসলমানদের জীবনাদর্শ ত্যাগের হলেও আমরা এখন ভোগ-বিলাসী হয়ে গেছি বেশী। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় অর্থের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা আমরা সঠিকভাবে মেনে চলি বলে মনে হয়না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র হক বাদে বান্দাহ্‌র হক আদায়ের দায়িত্ব যতটুকু আমাদের উপর আছে তা আমরা পালন করিনা। অবশ্য বর্তমানে এ অবস্থার কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। দায়িত্ববোধ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছনে আছি। আমরা কথা বলি বেশী কাজ করি কম। আমরা গরীব প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি অনেকটা উদাসীন। মুসলমানরা কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। সে কারণে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ যোগাড় করে নিতে তেমন কষ্ট হয়না। এমনকি মুসলমানদের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের চাইতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা অনেক সুদৃঢ়। ওরা রাজনীতি করে নিজেদের স্বার্থের জন্যে, সুবিধা আদায়ের জন্যে। আর আমরা রাজনীতি করি ক্ষমতার জন্য ও বিলাসিতার জন্যে। ফলে দেখা যায় বাংলাদেশে, মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশী অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল। অবশ্য ভারতের মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম। তারাতো এমনিতেই তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে সব দিক থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের লোক বলে মুনাফিকী জানেনা। সে কারণে চেচানিয়া, বসনিয়া, কাশ্মির প্রভৃতি জায়গায় মুসলমানরা চুক্তি ভঙ্গ করেনি। কিন্তু অপর পক্ষ চুক্তির কোন মূল্যই দেয়নি।

মসজিদ মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র

সৌদি আরবে মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র ঘরকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর মুসলমানরা নামাজ আদায় করে। কেবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করতে চতুর্দিকের মুসলমানরা কেউ পশ্চিম, কেউ উত্তর, কেউ দক্ষিণ আবার কেউ পূর্ব মুখী হয়ে নামাজ আদায় করে এবং উহা কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে। আল্লাহর ঘরকে বায়তুল আমান বা নিরাপদ ঘর বলা হয়। উহা দুনিয়াতে সর্বাধিক নিরাপদ স্থান। দুনিয়ার যত জায়গায় যত মসজিদ আছে সবগুলিই আল্লাহর ঘর। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিত অপর কেউ উহার মালিকানা দাবী করতে পারেনা। যারা মসজিদের তত্ত্বাবধান করে থাকে তারা মসজিদের খাদেম হতে পারে। তারা যে পদাধিকারীই হোক না কেন খিদমতকার হিসেবেই তাদের পরিচয়। প্রত্যেক

www.pathagar.com

মসজিদে ইমামের পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। জামায়াতের সহিত নামাজ আদায়ে সওয়াব বেশী। জামায়াতে উপস্থিত মুসল্লিরা নিজেদের কল্যাণে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ ধরণের ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্মে নেই। অথচ মুসলমানেরা মসজিদে ঝগড়া ফাসাদ করে বেশী। মসজিদ নিয়ে মামলা মোকাদ্দমা হয়। আমরা বায়তুল আমান বা শান্তির ঘরকে অনেক সময় অশান্ত করে ফেলি। হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘর বা 'শান্তি' নিকেতন' নাম দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। বায়তুল আমানকে মুসলমানদের সত্যিকার ভাবে শান্তির ঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই ইহকাল ও পরকালে আমাদের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন অর্জন সম্ভব হবে।

পাশ্চাত্যের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা বনাম ইসলামী জীবন ব্যবস্থা

বিশ্বে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কতিপয় পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বিশ্বের জন্য নতুন ব্যবস্থা দিতে চায়। পুঁজিবাদকে অবলম্বন করে নানাধরণের শোষণের হাতিয়ার চালু রেখে পারিবারিক বন্ধনকে শিথীল করে দিয়ে নানা ধরণের ব্যভিচারের মাধ্যমে শুধুমাত্র অর্থ ও অস্ত্রের প্রাধান্যের সাহায্যে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা নৈতিক অবক্ষয় ও আদর্শিক শূণ্যতার কারনে অবশ্যই ফেল মারতে বাধ্য হবে। ইসলামী বিশ্বের সম্প্রসারণ রোধ করার জন্যেই মূলতঃ উক্ত পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও পাশ্চাত্যের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা এখন মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ হিসেবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সকলের কাম্য। উহা ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবেনা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় গড়ে উঠা ব্যক্তি মুসলিম পরিচিতি নিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব পালনে বদ্ধ পরিকর থাকতে হবে। তিনি যদি পুরুষ হন তবে স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি অধিকারের দাবী তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। তখনই তিনি স্ত্রীর অধিকারের দাবী রাখতে পারেন। তিনি যদি পিতা হন তবে ছেলেমেয়েদের প্রতি ইসলামী বিধান মতে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। বৃদ্ধ মাতা পিতাকে পাশ্চাত্য দেশের মত সরকারী ভাতায় Old Age Home-এ অবহেলিত অবস্থায় রাখতে পারেন না। ছেলেমেয়েদের প্রতি যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনে স্নেহ-মমতা ও দোয়ার পরশে তাদের জীবন সুখী করে তুলতে অবশ্যই সচেষ্ট থাকবেন। ইহাই ইসলামী রীতি। তিনি যদি শিক্ষার্থী হয়ে থাকেন তবে মাতা-পিতা ও ভাইবোনদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য

www.pathagar.com

সহযোগিতা নিয়ে একজন পরিপূর্ণ মানুষের মত জীবন গঠনে তৎপর থাকতে হবে। তিনি কোনক্রমেই ওস্তাদ ও গুরুজনদের বৈধ আদেশের অবাধ্য হতে পারেন না। কারণ তিনি পরিবারের ও দেশের সম্পদ। হেলায় খেলায় জীবন কাটিয়ে দিয়ে কারো গলগ্রহ হওয়া তার কাজ নয়। মাতা-পিতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ইসলামের বিধান। তিনি যদি পেশাজীবি হন তবে পেশাগত দক্ষতা ও সততা নিয়েই কাজ করবেন। তার দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করা ইবাদাতের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে তার জবাবদীহিতা আছে। তিনি যদি রাজনীতিবিদ হন তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের আমানতকে খেয়ানত করতে পারেন না। তিনি ইসলামী বিধানের কথা ভুলে গিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিপরীতে কাজ করলে তবে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হারাবেন। তিনি যদি নারী হন তবে উত্তম কন্যা, উত্তম স্ত্রী, উত্তম ভগ্নি, উত্তম গৃহীনি, উত্তম দাদী, নানী ও উত্তম আত্মীয়া হওয়ার বিধান ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত। একজন মুসলিম পুরুষ তার পিতামাতা, স্ত্রী, পরিবার পরিজন, প্রতিবেশী ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতি বিশ্বস্থ থাকবেন ইহাই ইসলামের দাবী। এই যদি হয় তবেই তিনি উত্তম পিতা, উত্তম ছেলে, উত্তম স্বামী, উত্তম প্রতিবেশী, উত্তম আত্মীয়, উত্তম শাসক ও উত্তম নাগরিক হবেন। এ কারণেই একজন মুসলিম স্বামী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যে কোন স্বামীর চেয়ে বিশ্বস্ত হিসেবে পরিগণিত। নারী ও পুরুষ সম্পর্কে আল্ কোরআনে বলা হয়েছে স্বামী স্ত্রী একে অপরের পরিচ্ছদ স্বরূপ। এতে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক চুড়ান্তভাবে স্থিরিকৃত এবং নির্দেশিত। উপরে পুরুষের ব্যাপারে যে সব দায়-দায়িত্ব এবং অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা নারীর ব্যাপারেও সমভাবে প্রযোজ্য। নারীদের দৈহিক ও মানসিক যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাও ইসলামে ভারসাম্যমূলক। ব্যভিচার ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলেই মুসলিম পুরুষ ও নারী সংযতভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য। কোন একজন অমুসলিম মহিলাকে মুসলিম স্বামী কেন গ্রহণ করলেন জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দিলেন একজন মুসলিম স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি খুবই বিশ্বস্ত থাকে। তারা শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই এক স্ত্রী নিয়েই ঘর সংসার করে। মালয়েশীয়ার রমনীরা কেন বাংলাদেশী মুসলিম স্বামী পছন্দ করে তার উত্তরে বলা হল ওরা বিশ্বস্ত, ওদের হাসি মিষ্টি। যুক্তরাষ্ট্রে মহিলারা এক স্বামীতে সন্তুষ্ট নয়। স্বামী ছাড়াও তাদের একাধিক পুরুষ বন্ধু রয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চের প্রথম দিকে বৃটেনের ভাবী রাজা প্রিন্স চার্লস বাংলাদেশে এসেছিলেন। বৃটিশ রাজ পরিবারের সদস্যরা এবং বৃটেনের রাজনীতিকরা চলমান বিশ্ব রাজনীতির গতি প্রকৃতি বুঝে। মগজের গুণে তারা এখন বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিশেষ অবস্থানে আছে। প্রিন্স চার্লস বিনা দ্বিধায় বলেছেন ইসলামী বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বৃটেনে বাংলাদেশীদের অবদান তিনি আকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করেছেন। বর্তমানে ইসলামী বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বৃটিশ যুবরাজ পাশ্চাত্য এবং ইসলামী বিশ্বের মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে চলছেন। প্রিন্স চার্লস অক্সফোর্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন। তাতে তিনি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের সমন্বিত প্রয়াসের উপর জোর দিয়েছেন এবং পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির অবসানের আহবান জানিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলামী সভ্যতার অনেক অবদান আছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে ইসলামী দিবস গুলিতে অভিনন্দন বাণী পাঠান। বর্তমানে হোয়াইট হাউজে রমজানে ইফতার পার্টির আয়োজনও করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও হয়েছে। আমেরিকার ফাষ্ট লেডী হিলারী ক্লিনটন ও তাঁর মেয়ে সেলসি ক্লিনটন ইসলামী বই পুস্তক পড়েন। ইসলামের প্রতি তাঁদের এই আগ্রহ বিশ্ব রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বৃটেনের ভাবী রাজা বাংলাদেশে এবার গায়ে শাল ও মাথায় টুপি দিয়ে এদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয় জয় করেছেন এবং যুক্তরাজ্যে মুসলমানদের অবদানের কথাও স্বীকার করেছেন। এটা তাঁর রাজনীতির অংশ। ১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছিলেন। সাথে নিয়ে এসেছিলেন সেখানকার ইসলামী আন্দোলনের নেতা জনাব নূর মিশৌরীকে। তিনি ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত কয়েকটি দ্বীপ ও মিন্দানাও এর স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে দীর্ঘ দিন ধরে সংগ্রাম করে আসছিলেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট রামোসের সাথে তাঁর শান্তি চুক্তি হয়েছে। মুসলিম দেশ বাংলাদেশে নূর মিশৌরীকে তাঁর সাথে নিয়ে আসা তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি সমস্ত বিশ্বের মুসলমানদের প্রবল আকর্ষণ থাকা স্বত্বেও কোন কোন মুসলিম দেশে মুসলমান শাসকদের ইসলাম ভীতির কারণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মাত্র গুটি কতেক দেশে অনুসৃত হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ঘুরে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি পাশ্চাত্যের মুসলমানদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ আছে। তারা আমাদের বাংলাদেশের ছেলে মেয়ের মত ঝন্টু, মন্টু, মিন্টু, বাদল, লিটন ইত্যাদি নাম রাখেনা। মুসলিম পরিবারে ছেলেমেয়ে হলে কি ধরণের ইসলামী নাম রাখতে হবে তার তালিকা সম্বলিত বিভিন্ন ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা আছে। আমি তাদেরকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সচেতন দেখেছি। পশ্চিমা দেশে ইসলামিক সেন্টার, স্কুল, লাইব্রেরী ও মিলনায়তনে কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র আছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মুসলিমরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের ছেলে মেয়েদের এখানে নিয়ে আসে কোরআন শিক্ষার জন্যে এবং মিলনায়তনে কোরআন হাদিসের উপর আলোচনা হয়। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমগণ এতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। আমাদের দেশে আলেম সমাজ আধ্যাত্মিকতায় খুব সজাগ বলে দেখাতে চাইলেও অনেকে কিন্তু তা নয়। সে কারণে অনেকের দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে নানা প্রকার ফেরকাবাজীর সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে মনগড়া ফতোয়া দেন এবং ইসলামের শত্রুদের দ্বারা ব্যবহৃত হন। সম্মানিত আলেম সমাজের মধ্যে কিছু সংখ্যক নামধারী ওয়ায়েজী আলেম হালাল হারাম বিবেচনা না করে টাকার লোভে চলে যান যেখানে সেখানে। সমাজ বিরোধী ও অপরাধী লোকেরা তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে দোয়া কিনে নেয়। ওরা তাদের ধন দৌলত বৃদ্ধির জন্যে এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যে দোয়া করেন। একজন সুদখোর ও মদ ব্যবসায়ী কিংবা অন্য কোন প্রকার হারাম ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তি তাঁদেরকে বাড়ীতে দাওয়াত করে নিয়ে যায়। তিনি সেখানে হাত তুলে দোয়া করতে থাকেন হে আল্লাহ্ ! তাকে একি দিয়েছো আরো হাজার গুন বাড়াইয়া দাও। অর্থাৎ তার হারাম রোজগার আরো বাড়াইয়া দাও। তিনিতো সাহস করে বলতে পারেন না যে, হে আল্লাহ্ ! তাকে হালাল পথে উন্নতি দান কর, হালাল হাজত পূরণ কর। এভাবে যদি আমাদের সম্মানিত আলেমদের কেউ কেউ টাকা নিয়ে বিবেক বিক্রি করেন তবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা অবৈধ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না। উল্লেখ্য যে, অন্য ধর্মের সমালোচনা করার অনেক কিছুই আছে। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। হিন্দু দেবীদের বিষয় নিয়ে আমাদের প্রগতিবাদীরা কি এ পর্যন্ত কোন উচ্চ বাচ্য করেছেন? করা বাঞ্ছনীয়ও নহে। কারণ পবিত্র ইসলামে বলা হয়েছে যার যার ধর্ম তার তার জন্যে। ইসলাম এগিয়ে যাওয়ার ধর্ম, পিছিয়ে পড়ে থাকার ধর্ম নয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকায় অপরাধ প্রবণতার চেয়ে সৌদি আরবে অপরাধের হার হাজার ভাগের একভাগ। একই ভাবে ইরান, সুদান ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী জীবন

www.pathagar.com

ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সেখানে অপরাধ প্রবণতা না বেড়ে বরং দ্রুত গতিতে কমছে। দেশে দেশে কায়েমী স্বার্থবাদীরা ইসলামের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের দ্বারা ইসলামের মূল বা আসল রূপকে ঢাকা দিয়ে সুকৌশলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধে সচেষ্ট। ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ইসলামের উপর যতটুকু গবেষণা চলছে তার সিকি ভাগও এদেশে চলে বলে মনে হয়না। বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলীজা ইজ্জত বেগভিচ ইউরোপীয় কালচারে লালিত পালিত ও শিক্ষিত। তিনি *Islam Between East & West.* নামক যে বইটি লিখেছেন, তাতে তার জ্ঞানের গভীরতা লক্ষ্যণীয়। চেচনিয়ার অধিবাসীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে এতদিন চললেও এখন আর চলেনা। একটি সত্য কথা না বলে পারা যায়না, তা হল যত ধর্মের যত প্রচারক ছিলেন সবই এশিয়ার ভূ-খন্ড থেকেই উদ্ভব হয়েছেন। এ ভূ-খন্ডে সভ্যতার জন্ম হলেও বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমরা মুসলমানরা লেখাপড়া যা করি তা আমাদের অনেকেই আমল করিনা। মাদ্রাসা শিক্ষিতদের অনেকেইতো হাল জমানার খোঁজ খবর পর্যন্ত রাখেননা।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আজকের মুসলিম সমাজ

আমাদের আলেম সমাজের অনেকেই নিজেদের স্বার্থে এবং কায়েমী স্বার্থের স্বপক্ষে ইসলামের মূল আদর্শকে পাশ কাটিয়ে তাদের সুবিধামত ইসলামের অনুশাসন ও বিধি বিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের অগ্রযাত্রা এতে বেশ ব্যাহত হলেও কিন্তু রুদ্ধ হয়নি। অনেকে সওয়াবের জন্য ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করেন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ওয়াজ মাহফিলের সময় রাত নয়টার পর থেকেই শুরু হয়। মধ্যরাতে সিরনী বিতরণের সময় বাসন-কোসন ও ডেকচি-চামচের শব্দ শুনে অনেকের ঘুম ভাঙ্গে ও তন্দ্রা কাটে। মৌলভী সাহেবের ওয়াজ শুনার মত শ্রোতাদের কানও ছিলনা, গ্রহণ করার মত মনও ছিলনা । এরপর সকালে দেখা যায়, পাড়ার মসজিদে পাঁচ জনের বেশী ফজরের নামাজে মুসল্লিও হয় নাই। ধর্মীয়সভা নিয়ে কত বিতর্ক ! মিলাদ মাহফিল, মিলাদুন্নবী, মিলাদ শরীফ, ঈদে মিলাদুন্নবী, সিরাতুন্নবী, সিরাত মাহফিল, ওরশ মোবারক, খতমে গাউছিয়া ও আরো কত নামে কত ধরণের অনুষ্ঠান করে চলছি তার ইয়ত্তা নেই। ধর্মীয় সভাকে আদর্শ, শিক্ষনীয় ও হৃদয়গ্রাহী করতে হলে ওয়ায়েজীনদেরকে বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপক জ্ঞান চর্চা করতে হবে, কঠোর অনুশীলন করতে হবে, স্বভাব-চরিত্রে, চাল-

www.pathagar.com

চলনে, কথা-বার্তায় ও কাজে-কর্মে নিজেকে ইসলামের মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যেভাবে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ নিজের জীবনকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁরা অতি সাদাসিদে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁরা ছিলেন ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্মানিত ওয়ায়েজীনদেরকে আধুনিক জগতের হালচাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। তাঁরা হবেন ইসলামের মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ্তায়ালা আল্ কোরআনে বলেছেন, *'তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা করনা'।* আল্লাহর কাছে ইহা খুবই অপছন্দনীয়।

মুসলমানদের মেজবানে মেয়েদের জন্যে তোলা ভাত দেয়া হয়। কারণ পরিবারের মেয়ে সদস্যরা মেজবানে আসেন না। তোলা ভাত তোলা খানা মানে নিজের পয়সায় নয় বরং পরের পয়সায় যে সব উন্নতমানের খানাপিনা একশ্রেণীর ভাগ্যবানদের রিজিকে জোটে তা-ই। হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্য ধর্মের কিছু লোকও তোলা খানাপিনা পেয়ে থাকেন। এ জন্যে তাদের শরীর পুষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ভিক্ষু সম্প্রদায়কেও একই ভাবে নিজেদের রান্না করতে হয় না। পরের ঘর থেকে খানাপিনা আসে। সে জন্যে ওদের স্বাস্থ্যও ভাল। মুসলমানদের মধ্যে হুজুর শ্রেণীর এক বড় অংশ ভক্তদের কাছ থেকে তোলা খানা পিনা পেয়ে থাকেন। হিন্দু ও অন্যান্যরা পূণ্যলাভের জন্যে আর মুসলমানরা সওয়াব পাওয়ার জন্যে উৎকৃষ্টমানের তোলা খানাপিনা উল্লেখিত ব্যক্তিদের দিয়ে থাকেন। ফলে শেষোক্ত ভাগ্যবানদের স্বাস্থ্যও ভাল। এই সব যে একেবারে বিফলে যায় তা নয়। কারণ *"বিশ্বাসে পাইবে প্রভূ তর্কে কভূ নয়।"* প্রায় সব দেশে সরকারী খরচে কিছু আমলা ও মন্ত্রী পর্যায়ের লোক তোলা খানা পিনা পেয়ে থাকেন। নিজের পয়সায় রান্না করা লাগেনা। বাইর থেকে ওদের অনেকের জন্যে যে সব উপরি আসে তাতে করে তাদের নিজের পয়সায় খানা পিনার প্রয়োজন হয়না। তাই এ শ্রেণীর আমলা ও কর্তাদের স্বাস্থ্যও খুব হৃষ্টপুষ্ট। আমাদের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের অনেকেই ক্ষমতা পাওয়ার পর তাদেরকে আর চেনাই যায় না। এটাই হল মাননীয় এবং মাননীয়াদের দেশ সেবার নমুনা। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কম খেতেন। অন্যের ভাগে কম পরবে- এই মনে করে। একই ভাবে নিজে ও পরিবারের পোষাক পরিচ্ছদে কৃচ্ছ্বতা অবলম্বনের নীতি মেনে চলতেন অন্যদের কথা ভেবে। ইসলামের স্বর্ণযুগে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবাদের জীবন পদ্ধতিতেও একই নীতি অনুসৃত হত। অতীতে আমাদের আলেম সমাজের একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। বৃটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। আজ তারা সব দিকে থেকে সবচেয়ে পশ্চাদপদ। শুধু পশ্চাদপদ নয়

www.pathagar.com

অনেকটা সেকেলে, উৎপাদন বিমুখও বটে। ইসলামকে যথাযথভাবে উপলব্ধি ও উপস্থাপনে অনেকের জ্ঞান বুদ্ধি খুবই সীমিত বলে মনে হয়। প্রখ্যাত জার্মান কবি গ্যাটে জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে ইসলামকে পেয়েছিলেন। আর আমরা পেয়েছি কিভাবে ? তবে আমাদের আলেম সমাজ ইদানিং কিছুটা সচেতন হতে শুরু করেছেন বলে মনে হয়। এরূপ হলে কোন সমস্যাই থাকবেনা । শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আধ্যাত্মিক অধ্যায় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানবিক অবস্থান থেকেও যদি তাঁকে বিচার করা হয় তাহলেও তাঁর মত এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ , বৈচিত্রময়, আদর্শ মানব, মানবেতিহাসে অদ্বিতীয়। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের প্রভাব সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এখনো সমানভাবে বিরাজিত। আর এ জন্যেই Mical H. Hart তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত *** গ্রন্থে বিশ্বে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী একশত ব্যক্তির মধ্যে হযরত (সঃ) কে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছেন। গোটা মানবেতিহাসের সব শ্রেণীর মানুষের উত্তম আদর্শ হলেন তিনি। আল্লাহর কি মহিমা! সকল শ্রেণীর মানুষই তাদের নিজ জীবনের দুঃখ বেদনার সাথে আমাদের নবীর দুঃখ বেদনাকে মিলিয়ে ভাবতে পারেন। সকল শ্রেণীর মানুষই অকপটে ভাবতে পারেন যে তিনি আমার দুঃখ বুঝেছেন। কেননা আমার যত দুঃখ বেদনা, যাতনা সবই তিনি অতিক্রম করেছেন। যেমন, একজন পিতৃহীন ইয়াতীম বালক ভাবতে পারেন আমার নবী পিতৃহীন ইয়াতীম ছিলেন। একজন মাতৃহারা অনাথ ভাবতে পারেন আমার নবী আমার দুঃখ বুঝতেন কেননা তিনি নিজে শৈশবে মাতৃহারা হয়েছেন। একজন রাখাল বালক ভাবতে পারেন, আমার নবী আমার অভিজ্ঞতার পরশ নিয়েছেন। একজন সমাজ সেবক তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। কেননা কৈশোরে আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগে আরবদের মাঝে **"হিলফুল ফুজুল"** নামক সমিতি গঠন করে তিনি সমাজ সেবার অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে **আল আমিন** উপাধী লাভ করেছিলেন। একজন আদর্শ ধর্ম প্রচারক তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। এমনকি একজন লাঞ্ছিত ধর্মপ্রচারকও তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। একজন জ্ঞান তাপস, ধ্যানী সাধক ভাবতে পারেন আমার নবী হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একজন সাহসী যোদ্ধা তাঁর জীবনের মিল খুঁজে পাবেন, এমনকি পরাজিত যুদ্ধাহত একজন সেনাপতি তার যন্ত্রনার ভূবনে দ্বীনের নবীকে ঝান্ডা হাতে রণক্ষেত্রে দন্ডায়মান দেখতে পাবেন। তিনি একাধিক যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। আবার ওহুদের যুদ্ধে নিজে গুরুতরভাবে আহতও হয়েছেন। একজন বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, একজন শান্তির দূত, সাম্যের বাণী বাহক নিজেদের কর্মাধ্যায়ে দ্বীনের নবীকে অভিযাত্রী হিসেবে অতি নির্ভরতার সাথে গ্রহণ করতে পারেন। একজন পুত্রহারা পিতা ভাবতে

www.pathagar.com

পারেন, আমার নবী আমার ব্যথাকে বরণ করেছেন। এমনকি একজন বিপত্নীকও তার দুঃখের সাথে দ্বীনের নবীর দুঃখকে মিলিয়ে ভাবতে পারেন। একজন উপোস অন্নকাতর লোক পর্যন্ত নির্দ্বিধায় বলতে পারেন আমার নবী আমার দুঃখ উপলব্ধি করেছেন। তিনি বহু রজনী অনশনে কাটিয়েছেন। একজন তেজারতী বা ব্যবসায়ী তার কর্মক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তি অনুভব করতে পারেন এ কথা ভেবে যে, আমার নবী ব্যবসা করেছেন। একজন কূটনীতিক ভাবতে পারেন আমার নবী হুদায়বিয়ার সন্ধি রচনা করে বিশ্বের সেরা কূটনীতিকের মর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন। একজন পরোপকারী ও মানবতার শ্রেষ্ঠ অনুশীলনকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী ব্যক্তিও দ্বীনের নবীকে তার সাথে মিলিয়ে নিতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্ভরতায়। একজন বৃদ্ধ নানাও তাঁর সাথে নবীর উদাহরণ মিলিয়ে নিতে পারেন পরম তৃপ্তিতে। দ্বীনের নবী তাঁর প্রিয় নাতি হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) কে শৈশবে তাঁর পিঠে চড়িয়ে ঘোড়া চড়া খেলা করেছেন। একজন আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী,দয়ালু অভিভাবক দ্বীনের নবীকে নিজের করে ভাবতে পারেন উজ্জ্বল উদাহরণে । সর্বোপরি একজন সুদর্শন পুরুষ হিসেবে আমাদের নবী ছিলেন অনন্য। এ কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করা যায়, এমন বর্ণিল এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, এমন বহু মাত্রিক জীবনের উদাহরণ সহ পূর্ণমহামানবের দেদীপ্যমান জীবন উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিক তামাম দুনিয়ার অন্ধকার অলিতে গলিতে। আলোকিত হোক তামাম দুনিয়া বিশ্ব নবীর অনন্য আদর্শে। কবির ভাষায় বলা যায়-

"দিকে দিকে পূণঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন ইসলামী লাল মশাল,
ওরে বেখবর তুইও জেগে উঠ, তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।"

ধর্ম ও রাজনীতি এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই, বরং একে অপরের সম্পূরক। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই বিষয়ের উপর বিতর্কের কোন অবকাশ নাই। জীবন বিধান বলতে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি সহ সবই অন্তর্ভূক্ত বুঝায়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মূল পরিচয় মুসলিম। বনি ইসরাইলের মূল পরিচয় ইহুদী। যীশু খৃষ্টের অনুসারীরা খৃষ্টান। গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা বৌদ্ধ। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মূল পরিচয় হিন্দু। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে যে যাই বলুক না কেন ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্র ইসরাইল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এবং ঐ রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্যে পরাশক্তিগুলি একান্তভাবে

www.pathagar.com

তৎপর। কারণ তারা মুসলিম অধ্যুষিত আরবকে রাজনীতি এবং কূটনীতি দ্বারা বশে রাখতে চায়। খৃষ্টান শাসিত দেশগুলিতে শাসক বর্গের খৃষ্টান পরিচিতি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে হিন্দু শাসিত ভারতে হিন্দু পরিচিতিটা সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অনেক রাজনৈতিক নেতার কপালে তিলক বা জামার ভেতরে পৈতা থাকে। ভারতে যে কোন অফিসে যান সরকারী বেসরকারী হিন্দু পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের দেব দেবীর ছবি দেখতে পাবেন। ওরা ধর্মীয় আচার আচরণ পুরোপুরি মেনে চলার এবং অপর ধর্মের লোকদের অধিকার হারা করার জন্যে ধর্ম নিরপেক্ষ থাকে। আর আমরা মুসলমানরা বাংলাদেশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে গেলে সাম্প্রদায়িক হয়ে যাই। ওরা প্রচারের জোরে নগ্নভাবে পক্ষপাতিত্ব করেও ধর্মনিরপেক্ষ থাকে। আর আমরা মৌলবাদী বলে চিত্রিত হয়ে যাই। যদিও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনে কোন মুসলিম সাম্প্রদায়িক হতে পারেনা এবং বিচার বিবেচনার ব্যাপারে নিরপেক্ষতা হারাতে পারেনা। আমি ১৯৯২ সালে নয়াদিল্লীতে হিন্দুদের দেয়ালী পূজার সময় দেখি দিল্লী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিতরে বিরাট এলাকা জুড়ে দেয়ালী পূজার অনুষ্ঠান চলছে। একটা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের অফিসের ভিতরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান দীর্ঘ সময় ধরে করার পরেও ওরা ধর্ম নিরপেক্ষ থাকে। ভারতে নির্মিত ক্ষেপনাস্ত্র মারনাস্ত্র গুলির নাম রাখা হয়েছে অগ্নি, পৃথ্বি, ত্রিশূল, অর্জুন ইত্যাদি এইগুলি হিন্দু পূরান মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র।সামরিক ও বেসামরিক জলযান, স্থলযান ও অনেক কিছুর নাম রাখা হয়েছে হিন্দুদের দেব দেবী এবং রাজা, মহারাজা, সম্রাটদের নামানুসারে। হিন্দুস্থানে অশোক নামের ছড়াছড়ি সর্বত্র তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে কোন কিছুর নাম মুসলিম ও ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্য অনুসরণে রাখা হয়নি। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদে মানবিক দিকটা সুকৌশলে আড়াল করে রাখা হয়েছে। তাদের হাতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রয়াসে একদিকে শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে মানবিক অধিকার কেড়ে নেয়, অন্যদিকে দাতা সেজে রক্ষক ও ত্রাণ কর্তার ভান করে। ফিলিস্তিনে ওরা ইহুদীদের লেলিয়ে দিয়ে আরবদের ভিটাবাড়ী কেড়ে নেয় এবং ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইহুদী বসতি স্থাপন করে এবং ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের বুনিয়াদ মজবুত করে। বাস্তহারাদের জন্যে আবার ত্রাণ শিবির স্থাপন করে বিগত অর্ধশতক ধরে শিবিরগুলিতে খানাপিনা দিয়ে তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ আরবদেরকে তাদের মৌরুসী বসতবাড়ীতে থাকতে দিবে না আর তাদেরকে না খেয়ে মরতেও দিবেনা। এভাবে মুসলমানরা যে যেখানে আছে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার দাবিয়ে রেখে আন্তর্জাতিকভাবে পাতানো খেলা চলছে।

www.pathagar.com

তাদের সাথে যোগ দিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। পাশ্চাত্যের শক্তিগুলি মুসলমানদের প্রতি ন্যায়পরায়নতা পরিহার করে বিভিন্ন কলা কৌশলে দাতা হিসেবে পরিচিত হতে চায়। ওদের কূটনীতির আরেকটি দিক হলো- নারী সমাজকে উস্কিয়ে দিয়ে পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয়া। ওরা শুধু মুসলমান দেশেই নারী নেতৃত্ব চায়। যাতে নারী ও পুরুষদের মধ্যে দ্বন্ধ বেড়ে যায় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বে গোলযোগের সৃষ্টি হয় । যাতে নারী সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্টের খারাপ দিকটা রাষ্ট্রীয় জীবনকে কলুষিত করে। আল্লাহতায়ালা সূরা আর-রাহমানে *মিজান* সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। ন্যায় বিচার তথা বিচারের মানদন্ড সকলের জন্যে সর্বাবস্থায় একই। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এবং ভারতে ন্যায় বিচারের সংজ্ঞা দেয়া হয় তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুকূলে। সেখানে সাম্যের কোন বালাই নেই। সেখানে মুসলমানদের জন্যে একরকম বিচার, অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যে আরেক রকম বিচার, সর্বহারাদের জন্যে এক রকম বিচার, পুঁজিপতিদের জন্যে আরেক রকমের বিচারের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে উহা সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। মুসলমানরা ধর্মের প্রভাবে অসাম্প্রদায়িক বলেই বিচারের বেলায় আল্ কোরআনের নির্দেশ মত ন্যায়পরায়নতা অবলম্বন করতে বাধ্য। সে কারণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিচারবোধ প্রাধান্য পায়। মুসলমানদের বিচারবোধের কারণে বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমুসলিমদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা জনসংখ্যার দিক থেকে এক তৃতীংশ হওয়া সত্বেও আটটি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে মুসলিম ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র চার শতাংশ। সেখানে কোন ক্ষেত্রে মুসলমান কোন নেতা নেত্রীর নাম শুনা যায় না। বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বলেছিলেন খৃষ্টান ইউরোপে মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়া হতে দেয়া যায় না। তাই বসনিয়াতে ইউরোপ ও অন্যান্যরা জটিল রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে। ইসরাইল আরব বিশ্বে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেও সন্ত্রাসী হয়না। অপরদিকে কোন মুসলিম রাষ্ট্র আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিলেই সন্ত্রাসী হয়ে যায়। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে মসজিদে দিনে পাঁচবার মাইকে দুই তিন মিনিটের আযানে শব্দ দুষণ হয়। এই হলো তাদের বিচারবোধের নমূনা। নীতি ও আদর্শের ময়দানে এই শূণ্যতা অবশ্যই ইসলামের বিজয়কে অনিবার্য করে তুলবে।

www.pathagar.com

একজন ইসলামী চিন্তাবিদের মতে - যেহেতু হযরত দাউদ (আঃ) বীনা বাজিয়ে গান করতেন, তাই গান গাওয়া এবং বাজনা বাজানোকে হারাম বলা যায় না। কিন্তু সংগীতকে হতে হবে এমন যে তাতে যেন মনে পবিত্র ভাব জাগরিত হয়। সব রকম গান বাজনা হারাম নয়। আবার সব রকম গান বাজনা জায়েজও নয়। এ ক্ষেত্রে ভাল মন্দের বিচার করার সময় গান বাজনার উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনায় নিতে হবে। ইমাম গাজ্জালী একজন বিখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি এবং মুসলিম বিশ্বে বিশেষভাবে শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি সংগীতের উপযোগিতা ও ভাল মন্দের বিচার নিয়ে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'এহ্ইয়াউল উলুম আল দ্বীন'-এ। তার মতে, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটির এক একটি স্বাভাবিক কর্ম আছে। এই স্বাভাবিক কর্মের মধ্যে আছে আবার সুখ আস্বাদনের একটা বিশেষ অনুভূতি। চক্ষুর কাজ দর্শন করা। কিন্তু তা সুন্দর জিনিস দেখলে সুখ অনুভব করে। নাসিকার কাজ ঘ্রাণ গ্রহণ করা। সুগন্ধে সে প্রীত হয়। রসনার কাজ স্বাদ গ্রহণ করা। সুস্বাদু খাদ্যে সে সুখ লাভ করে। আমাদের হাত যখন কোন মসৃণ দ্রব্য স্পর্শ করে তখন তা সুখ লাভ করে। তেমনি কর্ণের কাজ শ্রবণ করা। কিন্তু কর্ণ চায় শ্রুতিমধুর শব্দ গ্রহণ করতে। হাদিস অনুসারে শ্রুতিমধুর স্বর শ্রবণ করা হালাল। একটি হাদিসে আছে-আল্লাহ সব নবীকে সুকণ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। ইমাম গাজ্জালী এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, যেহেতু ইসলামে দাউদ নবীর গানের প্রশংসা করা হয়েছে তাই গান হারাম, এ কথা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। ইমাম গাজ্জালী বীনা বাজানোকে জায়েজ বলেছেন। তিনি সঙ্গীতের মধ্যে ভালমন্দ পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, যে সঙ্গীত মানুষকে মদ পানে উদ্দীপ্ত করে তাকে ভালো বলা যায় না। কারণ মদ পানে মানুষের উপকারের তুলনায় ক্ষতি হয় বেশী। কিন্তু যে সঙ্গীত মানুষকে জিহাদে শহীদ হতে উজ্জীবিত করে তাকে ক্ষতিকর আখ্যা দেবার কোন যুক্তি নেই। সঙ্গীত হতে পারে মানুষের আত্মার ঔষধ। ইমাম গাজ্জালীর আগে আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০) খৃষ্টাব্দ আনুমানিক) সঙ্গীত বিষয়ে একটি বই লিখেন। তবে তাঁর লেখা কিতাব *আল্ মুজিকি আল্ কবির* খুব বিখ্যাত। তিনি নিজেও ছিলেন একজন উঁচু দরের সঙ্গীত বিশারদ। তিনি গান গাইতেন, বাজনা বাজাতেন। তিনি তাঁর বইতে কিভাবে স্বরের যথাযথ তাল মাত্রা বজায় রেখে গান গাইতে ও বাজনা বাজাতে হয় তা উল্লেখ করেছেন। আল ফারাবীর বই ইউরোপীয় সঙ্গীতে বেশ প্রভাব ফেলেছে। আল ফারাবীও মনে করতেন সঙ্গীত ধর্মের পরিপন্থী নয়। বরং সঙ্গীত মানব মনে প্রশান্তি এনে ধর্মের

www.pathagar.com

কল্যাণ সাধনে সক্ষম। ইবনে সীনার (মৃত্যু ১০৩৭ খৃঃ) সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনাও বিখ্যাত। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক মিষ্টার উইলিয়াম জোন্স ইবনে সীনার সঙ্গীত বিষয়ক মতবাদ নিয়ে বিশেষ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাও যথেষ্ট পরিচিত। ইবনে সীনাও সঙ্গীতকে হারাম বলে মনে করেননি। অবশ্য ইবনে সীনার দার্শনিক মতবাদ মুসলিম বিশ্বে এক সময় ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং একারণে ইবনে সীনাকে কিছুদিন আত্মগোপন করেও থাকতে হয়েছিল। মুসলিম সমাজে সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সঙ্গীত চর্চা হয়েছে প্রধানতঃ রাজদরবার এবং সূফী সাধকদের খানকাহ্ কে নির্ভর করে। বিখ্যাত সূফী সাধক জালালুদ্দীন রুমী বলেছেন- *'আমার বাঁশীর সুর শোন। পেতে পার তা থেকে মঞ্জিলের ঠিকানা।'* কথা যা বলতে পারে না সুর তা বলে দিতে পারে।

মনে হয় অনেক যুগ পরে জালালুদ্দীন রুমীর দর্শনের প্রতিধ্বনি করেছেন হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি লিখেছেন-*'মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান গেয়ে সে চরণ ছুঁয়ে যাই।'* গানকে মুসলিম সমাজে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন সূফী সাধকরাই। সূফীদের সব কথার সঙ্গে হয়তো আমরা এক হতে পারিনা। কিন্তু সঙ্গীতে তাঁদের অবদানকে স্বীকার করে নিতে কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না। এ উপমহাদেশে সঙ্গীতে মুসলিম অবদান কম নয়। এ ক্ষেত্রে যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৪)। তিনি ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দীন খলজীর প্রধানমন্ত্রী এবং গুরু। তিনি একজন সূফী সাধক ছিলেন। খসরু রাজদরবারে গেয়েছেন গজল, আর পীরের খানকায় গেয়েছেন কাউয়ালী। আমির খসরু সেতার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। গানের সঙ্গে আমরা যে বায়া তবলা বাজানো হয় তাও তারই উদ্ভাবিত বলে কথিত। তিনিই সৃষ্টি করেন ইমন ও পুরিয়াবান। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রধান চারটি গীত রীতি হলো ঃ ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী ও টপ্পা। এর মধ্যে একমাত্র ধ্রুপদ ছাড়া আর সব কটির উদ্ভাবক হলেন মুসলমান সঙ্গীতকারগণ। খেয়ালের উদ্ভাবক হিসেবে সাধারণত নাম করা হয় জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ্ শর্কীর। ঠুমরী ও টপ্পার বিকাশ ঘটে বিশেষভাবে লক্ষ্ণৌ এর নবাব দরবারে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত উত্তর ভারতের মুসলিম সমাজে ছিল এবং এখনও খুবই জনপ্রিয় আছে। পীরের খানকাতেও সঙ্গীত চর্চা হয়েছে যথেষ্ট। এক সময় ভারতের মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র সঙ্গীত চর্চার একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে খানকাহ গড়েন বিখ্যাত সঙ্গীত অনুরাগী মীর শেখ মোহাম্মদ। কথিত আছে তানসেন সেই খানকাতে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তানসেন নামটির উদ্ভব হয়েছে 'তানশাহ' থেকে। ফরাসী ভাষায়

www.pathagar.com

তান অর্থ হলো সুর আর শাহ অর্থ হলো রাজা। তানশাহ অর্থ হলো সুরের রাজা। ১৫৮৫ সালে তানসেনের মৃত্যু হয়। গোয়ালিয়রে তানসেনের কবর আছে। তানসেন সারং, কানাড়া প্রভৃতি বহুরাগ সৃষ্টি করেছেন। শোনা যায় তানসেন প্রথমে হিন্দু ছিলেন। পরে পীরের খানকায় সঙ্গীত অনুশীলনের সময় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুরা তানসেনকে খুব নিন্দা করেছেন। অনেকের মতে তানসেন মুসলমান হওয়ার আগে কাশীতে হরিদাস স্বামীর কাছেও গান শিখেন। তানসেন ছিলেন বাদশা আকবরের দরবারের সবচেয়ে বড় গায়ক। একদিন বাদশা আকবর জানতে পারলেন হরিদাস স্বামী তানসেনের চেয়ে ভাল গান করেন। বাদশা গোপনে তার গান শুনতে যান। গান শুনে এসে তিনি তানসেনকে বলেন, হরিদাস স্বামী সত্যিই তোমার চেয়ে ভাল গান করেন। তুমি অত ভাল গান করতে পার না কেন ? তানসেন বলেন, তিনি গান করেন দ্বীন দুনিয়ার মালিকের উদ্দেশ্যে আর আমি গান শুনাই হিন্দুস্থানের মালিককে। এ দুই গান কখনো এক হতে পারেনা।

বাংলার রাজদরবারে সঙ্গীত চর্চা ছিল। একসময় আরাকানের রাজদরবারে বাংলা কাব্য ও গানের যথেষ্ট চর্চা হয়েছে। মহাকবি আলাওল ছিলেন আরাকানের রাজসভার কবি। তিনি একজন সুগায়ক ও সঙ্গীত বিশারদও ছিলেন। তিনি সঙ্গীত বিষয়ে 'রাগনামা' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। বাংলার মুসলমানরা প্রধানতঃ পল্লীবাসী ও কৃষিজীবি। তাদের রয়েছে সমৃদ্ধ লোক সঙ্গীতের ঐতিহ্য। ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালী ও সারিগানের উদ্ভব ঘটেছে তাদেরই মধ্যে। বাংলার মুসলিম সমাজে বিয়ে বাড়ীতে গান গাওয়া হয়। হিন্দুদের মধ্যে এ রকম গীত গাওয়ার প্রচলন নেই। এটা এ দেশের মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গ। আরবেও বিয়ে বাড়ীতে গীত গাওয়ার প্রচলন আছে। আরবে মানুষ দফ বাজিয়ে বিয়ে বাড়ীতে গান করে। এ রকম বাদ্য বাজিয়ে গান করাকে সে দেশে কেউ দোষণীয় বলে মনে করেনা।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এক সময় সূফী সাধকদের চিন্তার প্রভাব ছিল প্রবলভাবে। কাদেরিয়া, নকশ্বন্দী, সুহ্‌রাহওয়ার্দী ও চিশতী তরিকার প্রভাব পড়েছে বাংলার মুসলিম সমাজে। এর মধ্যে চিশ্তী প্রভাবই এক সময় ছিল প্রবল। চিশ্তী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্তি (রঃ) ইসলামী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি মধ্য এশিয়া থেকে এসে আস্তানা গাড়েন আজমীরে। তাঁর শিষ্যরা তার মতবাদ প্রচার করেন বাংলাদেশেও। বাংলাদেশে সূফী প্রভাবেই উদ্ভব হয়েছে বাউল, মুর্শিদী ও মারেফাতীর গান। বাংলার মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামী গান অবিচ্ছেদ্য অংশ। শরিয়তী ও মারেফতীরা অবস্থান করছে এর পাশাপাশি। অবশ্য তাদের মধ্যে কখনো কখনো অপ্রীতিকর

www.pathagar.com

ঘটনাও ঘটে এ নিয়ে। শরিয়তীরা খাঁটি মুসলমান নাকি মারেফতীরা খাঁটি মুসলমান তা নিয়ে দ্বন্ধ হয়।

ইসলাম ধর্মের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এ ধর্মে কোন পুরোহিত প্রথা স্বীকৃত নয় (আল কোরআন, ৯ ঃ ৩১) । হাদিস শরীফে বলা হয়েছে "লা-রুহবানিয়াতা ফিল-ইসলাম" অর্থ্যাৎ ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই। ইসলাম একটি মধ্যপন্থী ধর্ম। ইসলামে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "মানুষের দিকে মুখ বিকৃত করোনা, মাটির উপর দর্প ভরে হেঁটোনা, কারণ আল্লাহ উদ্ধত আর অহংকারীদের ভালবাসেন না। নীচু স্বরে কথা বলো, গাধার কণ্ঠস্বর কারো প্রিয় নয়। (১৯ ঃ ১৮-১৯)" এ থেকে বুঝা যায় কর্কশ কণ্ঠে আযান দেওয়া ইসলাম ধর্ম সম্মত নয়। কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, দাউদ নবীর সুললিত কণ্ঠে যবুর পাঠে সাড়া দিত পাহাড়-পর্বত এবং বনের পাখিরাও গান গেয়ে উঠত (৩৪ ঃ ১৩)। গান গাওয়া হারাম হলে নিশ্চয়ই তাঁর গানের এ রকম প্রশংসা করা হতোনা কোরআন শরীফে। অভিযোগ করা হয় ইসলামকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হচ্ছে। এ রকম অভিযোগ উঠেছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খান, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, আল্লামা (স্যার শেখ মুহাম্মদ) ইকবাল সম্পর্কেও। এ রকম অভিযোগ উঠবে কেন ? যা বিচার্য হওয়া উচিত তা হল বক্তব্যের যুক্তি নিয়ে। ইসলামী মতে, আল্লাহর একটি সীফাত হলো যুক্তি। তাই যা যুক্তিসিদ্ধ তা কখনো ইসলামের পরিপন্থী হতে পারেনা। মুসলিম সভ্যতা গ্রীক দর্শন ও চিন্তাধারার কাছে ছিল বিশেষভাবে ঋণী। মুসলিম সভ্যতা ছিল চয়নবাদী বা Electic । আরবীতে সঙ্গীত বলে মুজিক। শব্দটা গ্রীক ভাষা থেকেই নেওয়া। আরবের উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে সঙ্গীতের চর্চা হয়েছে যথেষ্ট। হিন্দুস্থানী গীতরীতির মধ্যে খেয়াল এখনো সবচেয়ে জনপ্রিয়। আরবী শব্দ 'খয়াল' থেকে খেয়াল শব্দের উৎপত্তি। এ গীত রীতির উৎস খুঁজে পাওয়া যায় বাঙ্গালী গীত রীতির মধ্যেই। এ উপমহাদেশে সঙ্গীত সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান মোটেও কম নয়, বরং গৌরব জনক ভাবেই বেশী। বাংলাদেশে লোক সঙ্গীতের ভান্ডারও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। শিল্পী আব্বাসউদ্দীন পরিশীলিতরূপে এ লোকসঙ্গীত গেয়ে বিখ্যাত হন। কবি নজরুল ইসলামের ইসলামী ভাব ধারার গান এক সময়ে বাংলার মুসলমান সমাজে জাগরণ এনেছিল। নজরুল ইসলামের রচিত ইসলামী গান শিল্পী আব্বাস উদ্দীন অনেক গেয়েছেন। নজরুলের বিখ্যাত গান সমূহের সুর মধ্যপ্রাচ্যের তথা মুসলিম বিশ্বের সুরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। এত সুর বৈচিত্র নেই আর কারো গানে। আমাদের আলেমরা একসময় কবি নজরুল ইসলামকে কাফের বলেছিলেন, কিন্তু এখন সম্ভবতঃ তাঁরা আর তাঁর সম্পর্কে তা বলেন না। এমনিভাবে কাফের খেতাব

www.pathagar.com

পেতে হয়েছিল কবি-আল্লামা ইকবালকেও। এ কালে একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবি আছেন যারা সব কিছুতে ইসলামকে খাটো করার প্রচেষ্টা চালায়। ইসলামী সংস্কৃতি ভৌগলিক বা ভাষাগত অর্থে কোন জাতীয়, দেশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এমনিভাবে এ সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী এক উদার জাতীয়তা গঠন করে -যার মধ্যে বর্ণ, গোত্র, ভাষা, নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা। সমগ্র আদম সন্তানকে একই সূত্রে সম্পৃক্ত করার এবং তাদের সবাইকে একই সংস্কৃতির অনুসারী করে তোলার মতো যোগ্যতারও সে অধিকারী। এর আসল লক্ষ্য শুধু নিজ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই নয়, বরং আল্লাহ্ তার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যে যে নির্ভূল জ্ঞান ও কর্মনীতি দান করেছেন সমগ্র মানুষকে তার সুফলের অংশীদার করে তোলাই এর মূখ্য উদ্দেশ্য।

ইসলামকে একটি কঠোর ও নিরানন্দ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তরুণ মনে এ ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ জেগে উঠতে পারে। মনে হয় তা শেষ পর্যন্ত বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক একটি প্রতিবেশী দেশের হাতকেই শক্তিশালী করবে যেটা কখনো মুসলমানদের কাম্য হতে পারেনা। সুতরাং এ বিষয়টা গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে। ইসলামে যে মানবতাবোধ ও উদার নৈতিকতা বোধ রয়েছে, কেবল তাকে বাস্তবে উজ্জীবিত ও রূপায়িত করে এ দেশে ইসলামকে রক্ষা করা যেতে পারে। (পাক্ষিক পালাবদল)

ইসলামী চিন্তা-চেতনাঃ মুসলিম মন ও মননশীলতা

সব ধর্মের লোকের মন-মানসিকতা এক ও অভিন্ন নয়, হতেও পারেনা। কারণ ধর্মের প্রকৃতিগত কারণে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আর এ সবের ভিন্নতায় যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার প্রভাব গিয়ে পড়ে মানুষের মন ও মানসিকতায়। ইসলাম ধর্ম হিসেবে উদার বলে মুসলিম মন ও মানসিকতা অন্য ধর্মাবলম্বী অপেক্ষা ভিন্নতর ও উন্নততর। মুসলমানেরা যে পরিমাণ উদারনৈতিক হতে পারে অন্য ধর্মাবলম্বীরা তা পারেনা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মুসলমানেরা দুনিয়ার কোন দেশে আক্রমনাত্মক এবং আগ্রাসী ভূমিকায় নেই। বর্তমান বিশ্বের যেখানে রক্ত ঝরছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানেরাই রক্ত দিচ্ছে এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে আছে। তবে এ রক্ত বৃথা যাবেনা, ইহাই বিজয়ের সূচনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এ অশুভ তৎপরতার মোকাবেলায় মুসলিমগণ যে যেখানে থাকুন না তাদেরকে সেখানেই দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। মুসলিম মন ও মননশীলতা এ সংগ্রামকে জয়ী করবে। তবে এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হবে ঈমানী শক্তি সাহস ও হিক্‌মত।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মুসলিম চরিত্র

আল্‌ কোরআন ও হাদিসের আলোকে মুসলমানদের জীবন হবে সুন্দর সহজ এবং শান্তিপূর্ণ। বর্তমানে আমাদের মধ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। এতে ওদের অনুপ্রাণিত হওয়ার কিছু থাকেনা। মুসলমানদেরকে প্রতিবেশী হিসেবে পেয়ে অনেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশী তেমন আনন্দিত হয় বলে মনে হয়না। ওদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা চরমপন্থী। আমরা হানাহানি করি, কথায় কথায় জিহাদের কথা বলি। তবে এটা ঠিক যে বর্তমান বিশ্বে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানদের মসজিদ যতটা ভেঙ্গেছে মুসলমানরা অন্যদের উপসনালয় তেমনটি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে বলে প্রমান মিলেনা। উদাহরণ স্বরূপ বসনিয়া, বার্মা এবং ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। এর কারণ ইসলাম ধর্মের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে একটা ধর্মবোধ আছে। তা থেকে উৎসারিত হয় বিবেকবোধ ও বিচার বোধ। আমরা মুসলমানরা যদি রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর প্রদর্শিত পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মেনে চলি তবে পৃথিবীতে মুসলমানরাই সর্বোত্তম জাতি হিসেবে পরিগণিত হবে। আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায় বিচারের যে মিযান সূরা আর রাহমানে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন উহাই হলো ন্যায়ের পাল্লা, বিচারের পাল্লা। উহাতে আছে সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্যতা। যেমন- ১৯৪৮ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা হতে ইহুদীদের মূল আরব ভূ-খন্ডে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আরবদের ভিটা বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে সেখানে ইহুদী বসতি করা শুধু বিবেক নয় বিচারবোধ এবং সার্বজনীন ন্যায় পরায়নতা তথা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ভারতের বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির তৈরী ও কাশ্মীরের ব্যাপারও একই পর্যায়ের এবং বার্মায় সামরিক সরকার কর্তৃক মুসলমানদের বিতাড়ন ও অধিকার হরণ একই পর্যায়ের। এতে করে দেখা যায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার লক্ষ্যে বিচারের মানকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভূলুণ্ঠিত করে এর ব্যাখ্যা দেয়া হচেছ। ধর্মের প্রভাবে নিরপেক্ষতাবোধ সঞ্চারিত না হলে বিচারবোধ বিতর্কিত থাকবেই।

অতীতেও দেখা গিয়েছে মুসলিম বিজেতারা বিজিতদের উপর নিজেদের লাভ-লোভের জন্য রক্তপাত ঘটায়নি, কোন ধ্বংসাত্মক কাজ করেনি। মুসলমানেরা যে দেশে বসবাস করে সে দেশের প্রতি আনুগত্য রাখে, অন্যান্যদের সাথে সহাবস্থানে বিশ্বাস করে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি এবং গঠনমূলক কর্মসূচী নেয়। তারা দেশের সম্পদ পাচার করেনা। ইহা মুসলমানদের ঈমানেরই অভিব্যক্তি।

মুসলিমদের বৈবাহিক, পরিবারিক ও সামাজিক জীবন অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। নব্য তুরস্ক, বসনিয়া, হারজেগোভিনা ও চেচনিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতির দেশের মেয়েরাও বুঝেশুনে পর্দার পক্ষে আন্দোলনে নেমেছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য খ্রীষ্টান দেশের মুসলিম মহিলাদের থেকেও হিজাবের দাবী উঠেছে। ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে দুর্বার গতি সৃষ্টি হয়েছে তা নস্যাত করার লক্ষ্যে মুসলিম পারিবারিক জীবনে অনাচার, অরাজকতা, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির নিমিত্তে নারী সমাজকে উস্কানি দিয়ে সম্প্রতি কায়রো এবং বেইজিং এ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে । এতে যেসব সুপারিশমালা রাখা হয়েছে তা নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার নামে নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে ক্ষুন্ন করবে, নারী-পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে। এ অবাধ নিয়ন্ত্রনহীন স্বাধীনতা- নৈতিক উচ্ছৃংখলতা ও অবাধ যৌনাচারের জন্ম দেবে। পরিনামে ব্যাভিচারের সংজ্ঞাটাও বিলুপ্ত হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এ অশুভ যাত্রার বিরুদ্ধে কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ সহ সারা মুসলিম বিশ্বের চিন্তাশীলদের মাঝে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এমন কি খ্রীষ্টান ধর্মীয় গুরু ভ্যাটিকানের পোপ এবং অন্যান্য ধর্মের শুদ্ধাচার পন্থীরাও এরূপ সুপারিশের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

বর্তমানে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের কোথাও মুখ্যতঃ নারী নেতৃত্ব নেই, কিন্তু উহার ধারক-বাহকরা এবং তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত সন্তানেরা স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে উহা চাপিয়ে দিতে চায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। যেখানে ক্ষুধা দারিদ্র, নিরক্ষরতা নিত্যসহচর। তথাকথিত উন্নত বিশ্বের নারী পুরুষের অধিকাংশই অশ্লীলতা, বেহায়পনা ও যৌন কেলেংকারীতে লিপ্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমকামিতা এখন অবৈধ নয়, উহাকে আইনের পোষাকে বৈধ করা হয়েছে। একটি মহল চায় মুসলিম সমাজেও উশৃংখলতার জোয়ার বয়ে দিতে ও মুসলিম পারিবারিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিতে, সর্বোপরি মুসলিম সমাজ ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল ও বিক্ষুব্ধ করে তুলতে।

শেষ কথা

ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা হলেও এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব গভীর নয়। যারা নিজেদেরকে কোরআন হাদিসের খুব কাছাকাছি বলে মনে করেন তাদের জীবন পদ্ধতিও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। যেভাবে যা-ই পাই তাই গ্রহণ করার নীতি সততার সংকট সৃষ্টি করে। হযরত নবী করীম (সঃ) থেকে আরম্ভ করে প্রায় সাতশত বৎসর পর্যন্ত কোরআন এবং বিজ্ঞান চর্চা মুসলিম সমাজে প্রাধান্য পেয়েছিল। ইউরোপীয় রেঁনেসার অনেক উপাদান ইসলাম থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু কালক্রমে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কোরআন থেকে যতই দূরে সরে যেতে লাগলো ততই অন্ধকারে ডুবে যেতে শুরু করল। মুসলিম মণিষী মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর লিখিত *"ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান"* গ্রন্থাবলী অমূল্য সম্পদ এবং রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা সহ্ বিজ্ঞানের প্রায় সব ক্ষেত্রে যতদিন মুসলমানদের গবেষনামূলক বই পুস্তক ছিল ততদিন মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞানে ছিল অগ্রগামী। পরবর্তীতে স্পেনে মুসলিম মুর সভ্যতা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। বাগদাদে যে অমূল্য গ্রন্থাবলী ছিল তাও তৈমুর লঙ্গের সৈন্যরা পুড়ে ছারখার করে দেয়। অবশ্য পরবর্তীতে বিজয়ী সৈন্যরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বটে কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা বিরাজমান তা মূর্খতার সামিল। যতদিন মুসলমানরা আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান নিয়ে সাম্য-মৈত্রী ও আন্তরিকতার সাথে প্রশাসন চালিয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে ততদিন তাদের অগ্রগতি কেউ ঠেকাতে পারেনি। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাহচর্যে এসে তাদের জীবন প্রণালী অনুসরণ করে মুসলমানরা কালক্রমে ভোগবাদী হয়ে যায়। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেই মুখে বললেও বাস্তব জীবনে তার প্রমাণ মিলেনা।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব। যা মানুষকে অন্ধকার, কুসংস্কার, অসত্য, অসুন্দর, অত্যাচার, অবিচার, অপচয়, আত্মসাৎ ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে / ইসলামের শিক্ষা ও চেতনাকে আমরা মুসলমানেরা সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করে ধর্ম কে সঠিক ভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে চলছি। কাফের, জিহাদ ইত্যাদি শব্দাবলীর অপব্যবহার, অপব্যাখ্যা চলছে। প্রকৃত ঈমানদার ও মুসলমানদের পিঠে তথাকথিত মৌলবাদ বা চরম পন্থীর লেবেল এঁটে দিয়ে নানান বৈরীমহল ইসলাম ধর্মের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে সদা তৎপর।

ইসলাম বিশ্বাসীদের ধর্ম। মানব সমাজের সবাই বিশ্বাসী হতে পারেন। আমরা দেখতে পাইনা বলে বায়ুর অস্তিত্ব যেমন অস্বীকার করতে পারিনা না তেমনি মহাপ্রভূ আল্লাহ দৃশ্যমান নন বলে তাঁকে অস্বীকার করতে পারিনা। ইসলামধর্মের

www.pathagar.com

সার্বজনীনতা ধীরে ধীরে মানবজাতির উপলব্ধিতে আসতে শুরু করেছে। তাই বৈষয়িক লাভ-লোভ নয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানার জন্যে বিশ্বের সর্বত্র ইসলামকে আপন করে নিতে এগিয়ে আসছে বিশাল জনগোষ্ঠী। ওরা By conversion মুসলমান আর আমরা By Birth মুসলমান। পাক আমলে যতনা ছিল ঈমান তার চেয়ে বেশী ছিল লেবাস। তবে ইসলামী সংস্কৃতি প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল। বাংলাদেশ হবার পর আর্য-ব্রাহ্মণদের জীবনধারাকে জাতির মূলধারা আখ্যা দিয়ে কিছু সংখ্যক কু-বুদ্ধিজীবি ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনবোধকে সেকেলে ও প্রগতিবিমুখ আখ্যা দিয়ে কুসংস্কার ও অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে প্রয়াস চালায়। ভাগ্যভাল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল। না হলে আমাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা রক্ষা পেত কিনা সন্দেহ।

এক সময় বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিপন্ন হবার উপক্রম হলে আমি ও আমার মত অনেকেই রুখে দাঁড়াই। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন আর মাঠে-ময়দানে সভা-সমিতি, রাজপথে মিছিল করা সম্ভব নয় তাই চলার পথে সংগৃহীত কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আজকের মুসলিম সমাজ সম্পর্কে কিছু সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা।

ইসলাম ধর্মের মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আমরা দেখতে পাব যে, উহা ধর্মান্ধতা ও চরম পন্থা নয় বরং উহা ভারসাম্যপূর্ণ সুষম জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে এপার ও ওপার জগতের কিছুই বাকী নাই। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে উহা বৈপ্লবিক চিন্তা চেতনার উৎস যা আল্ কোরআনে ইশারা ইঙ্গিতে বলা আছে। জন্মিলে মরিতে হয়। দুনিয়ার কিছুই অনন্ত ও অসীম নয়। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ই অনন্ত অসীম। তিনি মহাশিল্পী ও কুশলী। সৃষ্টিজগত তাঁরই এক শিল্পকর্ম। কোন শিল্পীই তার শিল্পকর্ম ধ্বংস করতে চান না। তবে পাপের মাত্রা সীমাহীন ভাবে বেড়ে গেলে বিধাতা শাস্তি স্বরূপ তা ধ্বংস করে দেবেন। এটাই স্বাভাবিক। পার্থিব জীবনে ইসলামকে মিশন হিসেবে নিতে পারলে ইহকাল ও পরকালীন জীবনে সাফল্য আসবে।

কেননা মানুষ এধূলির ধরায় আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিনিধি।

www.pathagar.com

(সর্বশেষ নাযিলকৃত সুরা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

(পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু)

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুণ এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

(সূরা নসর)

www.pathagar.com

www.pathagar.com